মাসিক

আল্-মুবীন

THE MONTHLY AL-MOBEEN

রমজান সংখ্যা
জুলাই '১৪ইং

- কিয়ামত পূর্ব দ্বীনি ইলম নিরিবিলি পাহাড়ের চূড়া এবং জলমগ্ন নীচু জায়গায় চলে যাওয়া প্রসঙ্গে
- পায়গাম্বরের আনুগত্য
- মদ্যপান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ
- কেয়ামতের নিকটবর্তী যুগে সুদ ব্যাপক আকার ধারণ করিবে
- রহমত, বরকত ও মুক্তিলাভের মাস হচ্ছে মাহে রমজান
- পবিত্র লাইলাতুল ক্বদরের তাৎপর্য

এছাড়াও রয়েছে

- সম্পাদকীয়
- দরসে কোরআন
- দরসে হাদীস
- মুনীয়াতুল মুছল্লেমীন হ
  মাছআলা-মাছায়েল স

ছিপাতলী জামেয়া গাউছিয়া মুঈনীয়া কামিল মাদ্‌রাসার গৌরবের ৪০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে-বক্তারা

ছিপাতলী জামেয়া গাউছিয়া মুঈনীয়া কামিল মাদ্‌রাসা
জেলা-জাতি ও ইসলামের জন্য একটি অনন্য মাইলফলক

প্রকাশনায়: আজিজিয়া কাজেমী কমপ্লেক্স (ট্রাস্ট) বাংলাদেশ।

Pdf by (Masum Billah Sunny)
Sunni-Encyclopedia.
blogspot.com

সুন্দর আগামী জীবনের প্রত্যাশায়
ইসলামী চেতনাদীপ্ত নিরপেক্ষ মুখপাত্র

মাসিক
আল্-মুবীন

THE MONTHLY AL-MOBEEN

◆ রেজি নং-চট্টগ্রাম ১২৫ ◆ ২১ তম বর্ষ ◆ ৭ম সংখ্যা
◆ জুলাই ২০১৪ইং ◆ মাহে রমজান ১৪৩৫ হিজরী

প্রতিষ্ঠাতা-পৃষ্ঠপোষক ঃ
শায়খে ত্বরিকত, পেশোয়ারে আহলে সুন্নাত, হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব
মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী
(মাদ্দাজিল্লুহুল আলী)

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ
❀ শাহ্জাদা প্রফেসর ড. আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ মহিউদ্দীন
❀ উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল অদুদ
❀ আলহাজ্ব মুহাম্মদ ফজলুল হক চৌধুরী
❀ আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইদ্রিছ সওদাগর
❀ আলহাজ্ব আবদুল মন্নান সওদাগর
❀ আলহাজ্ব মৌলভী মাহবুবুল আলম
❀ মৌলভী মুহাম্মদ জিয়াউল হক সওদাগর
❀ আলহাজ্ব হাফেজ আবু তাহের
❀ আলহাজ্ব দোস্ত মুহাম্মদ সওদাগর
❀ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া চৌধুরী

সম্পাদক ঃ
◗ শাহ্জাদা অধ্যক্ষ আবুল ফরাহ্ মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দীন

সার্বিক সহযোগীতায় ঃ
✲ শাহ্জাদা মাওলানা আবুল ফাহিম মোহাম্মদ আলাউদ্দিন

নির্বাহী সম্পাদক
○ এম. এম. মহিউদ্দীন

লেখা পাঠানোর ঠিকানা :
এম. এম. মহিউদ্দীন
মোবাঃ ০১৮১৯-৩৬০৭১৮
ইমেইল করুন: almobeenctg@gamil.com

কার্যালয় :
মাসিক আল্-মুবীন
আলমুবীন কাদেরীয়া ভবন, ১৬/২ পুরাতন টি এন্ড টি রোড, চট্টগ্রাম

হাটহাজারী কার্যালয় :
মাসিক আল্-মুবীন
হাটহাজারী নোমানিয়া মাদ্রাসা লেইন, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
ফোন : ০৩০২৩-৫৬০৭৯/৫৬৪৯৭

ছিপাতলী কার্যালয় :
মাসিক আল্-মুবীন
খানকা-এ-কাদেরীয়া চিশতীয়া, ছিপাতলী, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

ব্যবস্থাপনায় :
আজিজিয়া কাজেমী কমপ্লেক্স (ট্রাস্ট) বাংলাদেশ

হাদিয়া :

বাংলাদেশ	ঃ ১২ টাকা	ইউরোপ	ঃ ১ ডলার
ইউ.এ.ই	ঃ ২ দেরহাম	ভারত	ঃ ৮ রুপি
ওমান	ঃ ২ দেরহাম	পাকিস্তান	ঃ ৮ রুপি
সৌদি আরব	ঃ ২ রিয়াল		

প্রকাশনায় ঃ আঞ্জুমানে কাদেরীয়া চিশতীয়া আজিজিয়া বাংলাদেশ

সূচিক্রম

সম্পাদকীয়	মাহে রমজানে ইবাদত-বন্দেগি	০৩
দরসে কোরআন:	পয়গাম্বরের আনুগত্য –অধ্যক্ষ শাহজাদা আল্লামা আবুল ফত্তাহ মুহাম্মদ ফরিদউদ্দীন	০৫
দরসে হাদীস:	কিয়ামত পূর্ব দ্বীনি ইমান নিরিবিলি পাহাড়ের চূড়া এবং জলময় নীচু জায়গায় চলে যাওয়া প্রসঙ্গে আল্লামা মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী রচিত "আল্-মারজান মিন মুখতারিস্ সহীহাইন" ৩য় খণ্ড হতে সংকলিত অনুবাদ: উপাধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুল অদুদ	১০
বিশেষ প্রবন্ধ:	রহমত, বরকত ও মুক্তিলাভের মাস মাহে রমজান শাহজাদা আল্লামা আবুল ফত্তিহ মুহাম্মদ আলাউদ্দীন	১২
বিশেষ প্রবন্ধ:	পবিত্র লায়লাতুল ক্বদরের তাৎপর্য এম.এম. মহিউদ্দীন	১৮
বিশেষ প্রবন্ধ:	কোরআন হাদীসের আলোকে সমাজব্যবস্থা মুহাম্মদ ওমর ফারুখ	২১
বিশেষ প্রবন্ধ:	একবচনের দেশ মুহাম্মদ ওহীদুল আলম	২৫
প্রবন্ধ:	কারো সীমাতিরিক্ত প্রশংসা না করা আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন	২৮
সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য:	মদ্যপান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এম.এম. ইয়াছিন হোসাইন	৩১
শিক্ষা সংস্কৃতি:	ক্ষমাই হচ্ছে মহৎগুণ মুহাম্মদ নুরুল আবছার	৩২
বিশেষ প্রবন্ধ:	কেয়ামতের নিকটবর্তী যুগে সূদ ব্যাপক আকার ধারণ করিবে মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল	৩৩
মাহআলা-মাহাজেল:	মুনীয়াতুল মুসলেমীন হতে সংকলিত মূল: আল্লামা মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী (মা.জি.আ.) অনুবাদ: এম. এম. মহিউদ্দীন	৩৫

সম্পাদকীয়

মাহে রমজানে ইবাদত-বন্দেগি

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানবজাতিকে তার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত প্রভৃতি যেমন আল্লাহর ইবাদত, মাহে রমজানে আল্লাহর নিয়ামত উপভোগ করে শুকরিয়া আদায় করাও অনুরূপ আল্লাহর ইবাদত। কিন্তু কুপ্রবৃত্তি মানুষকে আল্লাহর ইবাদত করা থেকে সর্বদা বিরত রাখতে চেষ্টা করে। তাই সিয়াম সাধনার মাধ্যমে কুপ্রবৃত্তিগুলো দম করে আল্লাহর ইবাদত সম্পন্ন করতে হবে।

রমজান মাসে ইবাদত-বন্দেগীর গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "হে লোক সকল! তোমাদের ওপর একটি মর্যাদাপূর্ণ ও বরকতময় মাস ছায়া বিস্তার করেছে। এই পবিত্র মাসের একটি রাত বরকত ও ফজিলতের দিক থেকে হাজার মাস থেকেও উত্তম। এই মাসের রোজাকে আল্লাহ তাআলা ফরজ করেছেন এবং এর রাত্রিগুলোতে আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়ানোকে নফল ইবাদতরূপে নির্দিষ্ট করেছেন। যে ব্যক্তি রমজানের রাতে ফরজ ইবাদত ছাড়া সুন্নত বা নফল ইবাদত করবে, তাকে এর বিনিময়ে অন্যান্য সময়ের ফরজ ইবাদতের সমান সওয়াব প্রদান করা হবে। আর যে ব্যক্তি এ মাসে কোনো ফরজ আদায় করবে, সে অন্যান্য সময়ের ৭০টি ফরজ ইবাদতের সমান পূণ্য লাভ করবে।"

বস্তুত এটি ধৈর্য, সবর ও সহনশীলতার মাস। এসবের বিনিময়ে বান্দা আল্লাহর কাছে জান্নাত লাভ করবে। এই মাস পরস্পর সৌজন্য ও সহৃদয়তা প্রদর্শনের মাস। এ মাসে বিশ্বাসী বান্দাদের জীবিকা প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। এ মাসে যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে, তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের আগুন থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং তাকে আসল রোজাদারের সমান পূণ্য দেওয়া হবে। কিন্তু এর জন্য প্রকৃত রোজাদারের সওয়াব কিছুমাত্র কমবে না। লোকেরা বলল: হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! রোজাদারকে ইফতার করানোর সামর্থ্য আমাদের মাঝে সবাই রাখেন না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "যে ব্যক্তি রোজাদারকে একটি মাত্র খেজুর, দুধ বা এক ঢোক পানি দ্বারাও ইফতার করাবে আল্লাহপাক তাকে এর সওয়াব দান করবেন। আর এটা এমন এক মাস, যার প্রথম ১০ দিন রহমতের, দ্বিতীয় ১০দিন মাগফিরাতের এবং তৃতীয় ১০দিন দোযখ থেকে মুক্তির জন্য নির্দিষ্ট। যে ব্যক্তি তার অধীনস্থ ব্যক্তির কাজ রমজান মাসে হালকা করে দেবে, আল্লাহপাক তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং জাহান্নামের আজাব থেকে নিষ্কৃতিদান করবেন।

অতএব, তোমরা রমজান মাসে চারটি সৎ কাজ বেশি বেশি করো। এর দুটি দিয়ে তোমরা আল্লাহ তাআলাকে খুশি করতে পারবে, তাহলো, 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই' এ সাক্ষ্যদান, আর আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চাওয়া। আর যে দুটি কাজ অত্যন্ত জরুরি, তাহলো, তোমরা আল্লাহর কাছে বেহেশত চাইবে এবং দোযখ থেকে মুক্তি চাইবে। আর যে ব্যক্তি রোজাদারকে পানি পান করাবে,

আল্লাহতাআলা তাকে আমার হাউজ থেকে এমন পানীয় পান করাবেন যে, বেহেশতে প্রবেশ করা পর্যন্ত সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না।' (বায়হাকী, ইবনে খুজাইমা)

প্রকৃতপক্ষে রোজা এমন এক বরকতময় ইবাদত, যার সঙ্গে অন্য কোনো ইবাদতের তুলনা চলে না। মাহে রমজানে সিয়াম সাধনাকারী রোজাদারের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কার ও অশেষ মর্যাদা রয়েছে। হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'রোজা আমারই জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দেব।' (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: 'আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে মানুষের আমল বা কাজ সাত রকমের। দুই রকমের কাজ এমন যে তার ফল কাজের সমান। আর এক রকমের কাজের ১০ গুণ সওয়াব রয়েছে। আর এক রকমের কাজের সওয়াব ৭০০ গুণ। আর এক রকমের কাজের সওয়াব আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। প্রথম দুটি হলো: যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ইবাদত করে, কাউকে তার সঙ্গে শরিক করে না এবং এই অবস্থায় আল্লাহর কাছে উপস্থিত হয়, তার জন্য জান্নাত অনিবার্য। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা অবস্থায় তার কাছে উপস্থিত হয়েছে, তার জন্য জাহান্নাম অনিবার্য। আর যে ব্যক্তি কোনো খারাপ কাজ করে সে তার একগুণ শাস্তি পায়। আর যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ করার ইচ্ছা করে কিন্তু কাজটা করে না, সে ওই কাজ করার একগুণ সওয়াব পায়। আর যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ করে, সে তার কাজের ৭০০ গুণ পর্যন্ত সওয়াব পায়। আর রোজা আল্লাহর জন্য হয়ে থাকে। এর সওয়াবের পরিমাণ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না।' (বায়হাকী ও তাবরানী)

মাহে রমজানে ইবাদত-বন্দেগিতে মানুষ এত অধিক মশগুল হয়ে পড়ে যে, সব ধরণের পানাহার ও ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করে রোজাদার ব্যক্তি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়, কোরআন তিলাওয়াত, জিকর-আযকার , তাসবীহ-তাহলীল ও দোয়া-ইস্তেগফার করে থাকে। এতদ্ব্যতীত নফল নামাজ আদায়, ইফতারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম শেষে দীর্ঘ জামাতের সঙ্গে খতমে তারাবি নামাজ আদায় এবং শেষ রাতে নিদ্রা ত্যাগ করে সেহরি খাওয়া, তাহাজ্জুদ নামাজ ও ফজরের নামাজ আদায়ও সম্পন্ন করে। রমজান মাসে দান-সাদকা প্রদানের ক্ষেত্রেও মানুষের মনে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে মাহে রমজানে ইবাদত-বন্দেগিতে নব প্রেরণার উদ্রেক ঘটে নিঃসন্দেহে।

রমজান মাসে ইবাদত-বন্দেগিতে উদ্বুদ্ধ করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ঈমানের দৃঢ়তা ও পুণ্য লাভের আশায় রমজানের রোজা রাখে তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। আর যে রমজানের রাতে ঈমানের দৃঢ়তা ও পুণ্যের আশায় জাগ্রত থেকে তারাবির নামাজ আদায় করে তার পেছনের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আর যে কদরের রাতে জাগে ঈমানের দৃঢ়তা ও পুণ্যের আশায় তারও পেছনের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।' (বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত)

আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে মাহে রমজানে ইবাদত-বন্দেগি করে সিয়াম সাধনার অশেষ সওয়াব হাসিল করার সৌভাগ্য দান করুন।

পয়গাম্বরের আনুগত্য

অধ্যক্ষ শাহজাদা আল্লামা আবুল ফরাহ মুহাম্মদ ফরিদউদ্দীন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٤)

হে মো'মিনগণ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করে যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিবে এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তরালে থাকেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে একত্র করা হবে। (সূরা : আনফাল, আয়াত: ২৪)

এই আয়াতে করীমায় তিনটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। ইয়া (يا) দ্বারা সম্বোধন, ইস্তিজাবত (সাড়াদান)'র বিধান এবং يُحْيِيكُمْ (তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে) এর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা।

এক. সমস্ত উম্মতগণকে তাদের নাম নিয়ে ডাকা হয়েছে। يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْا (হে য়াহুদীগণ!) يَا بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ (হে বনী ইস্রাঈল!) ইত্যাদি। কিন্তু উম্মতে মোস্তফা আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামকে অত্যন্ত প্রিয় সম্বোধন اٰمَنُوْا দ্বারা ডাকা হয়েছে। যদিও মো'মিন তারাও ছিল কিন্তু এই সম্বোধন মুসলমানদের জন্য বিশেষ করা হয়েছে। কেননা মুসলমানদের পয়গাম্বর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকেও তাঁর পবিত্র নাম নিয়ে ডাকা হয়নি বরং ডাকা হয়েছে সুন্দরতম উপাধি দ্বারা। দ্বিতীয়তঃ সম্বোধন দ্বারা বুঝা যায় যে, তারপর ক্রোধ হবে, না দয়া। একজনকে বলল, হে অপদার্থ! প্রতীয়মান হল-অসন্তোষ। একজনকে ডাকা হল- ওহে প্রিয়! প্রতীয়মান হল-অনুরাগ। এই সম্বোধন দ্বারা আল্লাহর অনুকম্পাই বুঝা যাচ্ছে। সব কিছু হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের বদৌলতেই।

দুই. اُسْتَجِيْبُوْا থেকে প্রতীয়মান হল-হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে সাড়া দেয়া সর্বাবস্থায় ওয়াজিব। নামাযের মধ্যে থাকুক কিংবা স্ত্রী সহবাসে; সর্বাবস্থায় আনুগত্য অপরিহার্য। একদা হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাক দিলেন তখন তিনি নামাযে ছিলেন। তাড়াতাড়ি নামায শেষ করে উপস্থিত হলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন, এত দেরী কেন হল? তিনি আরজ করলেন, নামাযে ছিলাম। ফরমালেন, তুমি কি এই আয়াত পড়নি يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ অর্থাৎ যদিও নামাযের মধ্যে ছিলে কিন্তু আমার ডাক শুনে তৎক্ষণাৎ চলে আসা উচিৎ ছিল। কিছু কিছু অবস্থায় নামায ভেঙ্গে ফেলা জায়েয। তন্মধ্যে একটি হল মায়ের ডাকের সময় যখন মা জানে না যে, আমার ছেলে নামাযে রয়েছে এবং নামাযও নফল হলে। কোন প্রাণহানি ঘটার আশঙ্কা দেখা দিলে যেমন কোন অন্ধলোক কূপের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে এবং নামাযী নামাযের মধ্য থেকে দেখতে পেয়েছে। এক দেরহাম পরিমাণ ক্ষতির আশংকায় যেমন নামাযীর সওয়ারী পালিয়ে যাচ্ছে অথবা রেল ছেড়ে যাচ্ছে ইত্যাদি। (দেখুন শামী কিতাবুস সালাত) মায়ের ডাকে নামায ভেঙ্গে দেয়া জায়েয, পিতার ডাকে নয়। কেননা সম্মান পিতার বেশী

পিতার ডাকে নয়। কেননা সম্মান পিতার বেশী তার জন্য দাঁড়িয়ে যেতে হবে এবং খেদমত মায়ের বেশী। (রূহুল বয়ান এই আয়াত প্রসঙ্গ) কিন্তু মায়ের ডাকে কেবল নফল নামায ভাঙ্গা যায় ফরয নয় এবং এতে নামায ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু হুজুর আলাইহিস্ সালামের ডাকে নামাযও ছেড়ে আসতে হবে এবং এই আসা যাওয়াতে নামায ভাঙ্গবে না।

সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত যে, তাঁরা সর্বাবস্থায় প্রিয়নবীর নির্দেশের আনুগত্য করতেন। বোখারী শরীফ গোসল অধ্যায়ে রয়েছে-একজন সাহাবীকে হুজুর আলাইহিস্ সালাম ডাক দিলেন তখন সে তাঁর স্ত্রীর সাথে সহবাস করছিল। সহবাস শেষ না করে ওই অবস্থায়ই চলে এল। হুজুর ফরমালেন, لَعَلَّنَا اَعْجَلْنَاكَ (হয়তঃ আমি তাড়াহুড়ায় ফেলে দিয়েছি) আরজ করল, হাঁ, ইরশাদ করলেন, বীর্যপাতহীন সঙ্গমেও গোসল ওয়াজিব হয় অর্থাৎ বীর্যপাত হওয়ার পূর্বে স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে গেলেও গোসল করতে হবে। এই ঘটনা থেকে এই মাসয়ালা প্রমাণিত হল। অনুরূপভাবে সাহাবী হযরত হানযালা (রা.) জমীলাকে বিবাহ করেছেন রাতে সহবাস করেছিলেন, গোসল করেননি এমতাবস্থায় উহুদ যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য আহবান পৌঁছল এই অবস্থায়ই তাঁর নবুয়তের ডাকে রওয়ানা হন এবং শহীদ হয়ে যান সাহাবীগণ দেখতে পান-শহীদগণের মধ্যে তাঁর লাশ জমিনের থেকে পানি ঝরছে এতে তারা আশ্চর্য হন। তাঁর সহধর্মিনী জানান তিনি অপবিত্র অবস্থায় ছিলেন। হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ফরমালেন, তাকে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়েছেন। এইজন্য তাঁর নাম গসীলুল মালায়েকা। (দেখুন কবীরের [illegible])

اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے

অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত ও গোলামীই সমস্ত ফরযের মূল।

নুকতা (সূক্ষ্ম বিষয়): এখানে দু'টি বিষয় বুঝে নিতে হবে। প্রথমতঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাককে এত গুরুত্বপূর্ণ কেন করা হল যে, সর্বাবস্থায় সাড়া দান অপরিহার্য করা হয়েছে? দ্বিতীয়তঃ ইরশাদ হয়েছে, لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ তারপর বলা হয়েছে دَعَاكُمْ (এক বচনের শব্দ)। আহ্বানকারী একজন কিন্তু আনুগত্য দু'জনের, আল্লাহ ও রাসূলের। কথা হল- মুসলমান পুরুষ হুজুরের গোলাম এবং মুসলমান নারী হুজুরের বাঁদী اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ (নবী মো'মিনদের প্রাণ অপেক্ষা ঘনিষ্টতর) اَوْلٰى এর অর্থ হয়তঃ اَقْرَبُ নিকটতর যেমন কাসেম নানুতভী সাহেব তাহযীরুন্নাস লিখেছেন অথবা اَمْلَكُ অধিকতর মালিক। দেখুন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত যয়নবের নিকট হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (তাঁর আযাদকৃত গোলাম)'র বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন তখন তিনি এবং তার ভাইগণ অস্বীকৃতি জানালেন। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হল مَا كَانَ لِمُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ الاية অর্থাৎ যখন আল্লাহ ও রাসূল কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন তখন কারো পক্ষে (তা) কবুল না করার অধিকার নেই। যেমন মনিব যেখানে ইচ্ছা তার দাসীকে বিবাহ দিতে পারে তা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার দাসীর নেই। এইরূপই হয়েছে এখানে। অথচ বিবাহ সম্পাদনের জন্য নারীর অনুমতির প্রয়োজন হয়ে থাকে। তা ছাড়া হুজুরের উপর যাকাত ফরয নয়।

যাকাত দিলে কাকে দিবেন সবাইতো তার গোলাম, নিজের গোলামকে যাকাত দেয়া জায়েয নেই। তবে কোন কোনটা বিধান চালু করণের জন্য হয়েছে এটা তাঁর দয়া। যেমন নবী পত্নীগণ মো'মিনদের মাতা কিন্তু মীরাছ নেই। আর মালিকানাধীনের জন্য মনিবের ডাকে সাড়া দেয়া অপরিহার্য।

দ্বিতীয় বিষয়ের কারণ হল এই যে, হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস্ সালামের ডাক মূলতঃ আল্লাহরই ডাক। এটাই কুরবে ইলাহী (খোদার সান্নিধ্য) ও ফানাইয়ত ফিয্যাত (আল্লাহর সত্তায় বিলীনতা)'র মাকাম যে, তাঁর কর্মকে নিজের কর্ম বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এইজন্য আয়াতে উল্লেখ রয়েছে আল্লাহ ও রাসূলের কিন্তু دعا শব্দ এনেছেন এক বচনের। সুতরাং এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও তোমরা নামাযের মধ্যে আল্লাহকে স্মরণ করতে থাক কিংবা কোন পার্থিব কাজে লিপ্ত থাক যখনই আল্লাহ নবী ডাকবেন তৎক্ষণাৎ হাজির হয়ে যাও। হুজুরের নির্দেশ পালন করা যেন আল্লাহর নির্দেশ পালন করা।

তিন. لِمَا يُحْيِيْكُمْ এর দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে। প্রথমতঃ এই ইবারত متعلق এর دعاكم (সংশ্লিষ্ট) এবং لام মওসূলা (موصوله) ما বর্ণটি الى অর্থে ব্যবহৃত। يحييكم সিলা (صله)। অর্থ হল- যখন তোমাদেরকে রাসূল এমন কাজের জন্য ডাকেন যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে। ঈমান, ইলম, জিহাদ, শাহাদত, নামায বা যে কোন কাজের জন্য ডাকেন-এসব কিছু রূহানী জীবন দান করে।এমনকি যদি তিনি ব্যক্তিগত কোন আনুগত্যের জন্য ডাকেন তা হলে তৎক্ষণাৎ চলে এসো, না নামাযের চিন্তা কর, না অন্য কোন ইবাদতের; কেননা তাঁর আনুগত্যই সমস্ত আমলের মূল।

مولیٰ علی نے واری تری نیند پہ نماز

اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے

معلوم ہوا کہ جملہ عبادت فروع ہے

اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے

অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার নিদ্রার জন্য মাওলা আলী (রা.) নামায কুরবান করেছেন তাও আসর যা সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। প্রতীয়মান হল- সমস্ত ইবাদত শাখা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামীই সমস্ত ফরযের মূল।

অথবা لام তা'লীলিয়্যা এবং এটা استجيبوا এর متعلق (সম্পর্কিত) অর্থাৎ তাঁর ডাকে চলে এসো, কেননা তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করবেন। তার ব্যাখ্যা এই শে'র দ্বারা হতে পারে।

صد ہزاراں جبرئیل اندر بشر ☆ بہر حق سوئے غریباں کن نظر

হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালামকে আল্লাহ তায়া'লা সেই মাহাত্ম্য ও রূহানিয়াত দান করেছেন যে, তিনি যে বস্তুকে স্পর্শ করেন তা জীবিত হয়ে যায় বরং ওই বস্তুও যার সাথে লাগে তাকেও জীবিত করে দেয় অতঃপর এটাও যার সাথে লাগে তাও জীবিত হয়ে যায়। এইজন্য কুরআন করীমে তাঁকে রূহ বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- بِرُوْحِ الْقُدُسِ- فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا ইত্যাদি।

অতএব ফিরআউন যখন কিবতীগণকে সাথে নিয়ে মূসা আলাইহিস্ সালামকে ধাওয়া করল তখন সে একটি নর ঘোড়ায় সওয়ার ছিল। মূসা আলাইহিস্ সালাম বনী ইস্রাঈলসহ নীলনদ শুকিয়ে তাতে ঢুকে যান এবং পানি পাহাড়ের ন্যায় উভয় পার্শে দাঁড়িয়ে আছে। ফিরআউন ঘাবড়ে গেল। ভাবতে লাগল পানিতে রাস্তা কিভাবে সৃষ্টি হল, আমি তাতে প্রবেশ করব কিনা? সিদ্ধান্ত নিল প্রবেশ করবে না। তখন হযরত জিবরীল আমীন একটি

মানী ঘোড়ায় আরোহণ করে আগে আগে যেতে লাগলেন। ফিরআউনের ঘোড়া নিয়ন্ত্রণহারা হয়ে নীলনদে ঢুকে পড়ল এবং সবাই ডুবে মারা গেল। কিন্তু জিবরীলের ঘোড়ার খুর যেখানে পড়তো ওখানে ঘাস সৃষ্টি হতো। বনী ইস্রাঈলের একজন স্বর্ণকার তার খুরের নীচ থেকে মাটি তুলে নেয়। এখান থেকে নাজাত পেয়ে স্বর্ণের গোবৎস তৈরী করে এবং তাতে ওই মাটি লাগিয়ে দেয়। এতে গোবৎসের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হয়ে নড়াচড়া সৃষ্টি হয় এবং তার পূজা আরম্ভ করে দেয়।

এ ছিল গরু পূজার সূচনা। যেমন নমরূদের অগ্নি থেকে অগ্নিপূজা ও ফাল্গুনী উৎসবের উৎপত্তি হয়েছে। যখন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের গোফন (যে যন্ত্রের সাহায্যে তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়) ভারী হয়ে যায় তখন শয়তান বলল, এতে পরস্পর বস্তু নিক্ষেপ করে অপকর্ম কর। এতে রহমতের ফেরেশতাগণ চলে যাবে এবং গোফন হালকা হবে। অতঃপর তাই করা হল। এটাই ছিল ফাল্গুনী উৎসবের সূচনা।

দেখুন, যে ঘোড়াকে জিবরীল স্পর্শ করেছে ওই ঘোড়ার সংস্পর্শে মাটিতে প্রাণ এসেছে এবং মাটির সংস্পর্শে গোবৎসের মধ্যে প্রাণ এসেছে। মাওলানা রুমী (রহ.) আরজ করেন, ইয়া হাবীবাল্লাহ! আপনি তো মনের কিছু এইরূপ হাজারো জিবরীলের কল্যাণিত ও ক্ষমতা আপনার মধ্যে রয়েছে যদি আমি অধমের প্রতি আপনি নজর (দৃষ্টি) দান করেন তা হলে আমিও জীবন পেয়ে যাব। তাঁর নজরের তো এই অবস্থা যে, একদা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা হুজুরের চাদর মোবারক কাঁধে ধারণ করলেন তখন সপ্ত আসমান ও সপ্ত জমিন প্রকাশিত হয়ে যায় যাকে মাওলানা রুমী এইভাবে বর্ণনা করেছেন:

مصطفےٰ روزے بگورستاں برفت ☆ باجنازۂ یارے از یاراں

একদিন নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক সাহাবীর জানাযার উদ্দেশ্যে কবরস্থানে গমন করেন।

خاک را در گور آگندہ کرد ☆ زیر خاک آں دانہ اش را زندہ کرد

কবরের মধ্যে মাটি ভরাট করলেন, মাটির নীচে (রোপন করা বীজের ন্যায়) তাঁকেও জীবিত করলেন।

چوں ز گورستاں پیغمبر باز گشت ☆

سوئے صدیقہ شد و وہمراز گشت

পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কবরস্থান থেকে প্রত্যাগত হন অন্তরঙ্গ সহধর্মিনী আয়েশা ছিদ্দীকা (রা.)'র নিকট আগমন করেন।

چشم صدیقہ چو بر روئش فتاد ! ☆ پیشش آمد دست بروی می نہاد

হযরত সিদ্দীকার দৃষ্টি যখন তাঁর চেহারা মোবারকে পড়ল সম্মুখে এসে তাঁর বস্ত্রাদিতে হাত লাগিয়ে দেখতে লাগলেন।

گفت باراں آمد امروز از سحاب ☆ گفت پیغمبر چہ می جوئی شتاب

তিনি ফরমালেন, হে আয়েশা! তুমি কি দেখছো? তিনি আরজ করলেন, আজ মেঘ হতে বারি বর্ষণ হয়েছে।

جامہایت می بجویم در طلب ☆ تر نمی بینم ز باراں اے عجب

অথচ আশ্চর্য আমি আপনার বস্ত্রাদিতে ওই বৃষ্টির কোন চিহ্ন দেখছি না।

گفت چہ بر سر فگندی از ازار ☆ گفت کردم آں ردایت را خمار

হুজুর ফরমালেন, তুমি মাথায় কি পরেছিলে? তিনি আরজ করলেন, আপনার চাদর মোবারক।

گفت بہر آں نمود اے پاک جیب ☆ چشم پاکت را خدا باران غیب

হুজুর ফরমালেন, হে পুণ্যশীলা! ঐ চাদর পরিধানের বরকতে তোমার পবিত্র চক্ষুদ্বয়ে আল্লাহর অদৃশ্য বৃষ্টি দেখিয়েছেন।

نیست ایں باراں ازیں ابر شما ☆ ہست باراں دیگر و دیگر سما

যে বৃষ্টি তুমি দেখেছো, তা এই দৃশ্যত আসমানের নয় বরং তা ভিন্ন বৃষ্টি তার মেঘ ও আসমানই ভিন্ন।

উম্মতে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন ওলিয়ে কামিল হযরত খিযির আলাইহিস্ সালামকে খিযির এইজন্য বলা হয় যে, তিনি যেখানে পা মোবারক রাখেন ওখানে সজীবতা এসে যায়। খিযির অর্থ-সবুজ ও তাজা। তাঁর পবিত্র চরণে রয়েছে এই জীবন। তা ছাড়া যখন তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নির্দেশে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম তাঁর সহচর ইউশা আলাইহিস সালামকে নিয়ে রওয়ানা হন তখন পথিমধ্যে ভাজা মাছ নাশতাদানে রাখলেন। যখন দু'দরিয়ার মিলনস্থলে পৌঁছলেন তখন ওই মাছ সেখানকার আবহাওয়ার প্রভাবে জীবিত হয়ে পানিতে সাঁতরিয়ে যায় এবং পানিতে ছিদ্র হয়ে যায়। ওই আবহাওয়ার মধ্যে জীবনদানের এই প্রভাব হযরত খিযির আলাইহিস্ সালামের বরকতে হয়েছিল।

এতো আউলিয়ায়ে উম্মতের অবস্থা তা হলে ওয়ালিয়ে উম্মত কি ধরনের জীবন দান করেন নিজেই অনুমান করুন। এইজন্য আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারসমূহের নিকট মুর্দা দাফন করা উত্তম। কারণ আল্লাহর যে অনুগ্রহরাজি তাদের উপর হচ্ছে তারা তাদের প্রতিবেশীগণকে তা থেকে বঞ্চিত করবেন না। কোন বড় লোকের নিকট বসলে তাকে যে পাখা করা হচ্ছে তার বাতাস আমাদের নিকটও পৌঁছে যাবে। এই কারণে মদীনা পাকের নামায পঞ্চাশ হাজার নামাযের সমান এবং মক্কা মুয়ায্যমায় এক লাখের সমান। কারণ ওখানকার আবহাওয়া নামাযের জন্য অধিক উপযোগী। যেমন পাহাড়ী এলাকার ফল খুব বড় ও মোটা হয়ে থাকে।

মক্কা মুকাররমার নামাযে মদীনা মুনাওয়ারার নামায অপেক্ষা সওয়াব বেশী কিন্তু মর্যাদার ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন। এইজন্য যদি মদীনা শরীফে জমাআত সহকারে নামায পড়া হয় তা হলে ইমামের ডান দিকে সওয়াব বেশী কিন্তু বাম দিকে মর্যাদা বেশী। কারণ বাম দিকে রওজা পাকের নৈকট্য রয়েছে। রওজা পাকের অবস্থান বাম দিকে। যেমন মানব দেহের মধ্যে অন্তরের অবস্থান বাম দিকে। মর্যাদা এক কথা সওয়াব অন্য কথা। যদি বাদশাহ কোন সিপাহীর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করে এবং উজিরকে কিছু না দেয় তা হলে সিপাহী এই পুরস্কারের কারণে উজির অপেক্ষা বড় হয়ে যাবে না। মর্যাদা উজিরেরই বড় থাকবে।

একদা কিছু লোক হযরত তালহা (রা.)'র ঘরে দাওয়াত খাওয়ার জন্য গমন করে। দস্তরখানা ছিল ময়লাযুক্ত। গৃহস্বামী ওটা আগুনে ফেলে দেয়। কিছুক্ষণ পর তাকে নিরাপদে বের করল তখন ওটা পরিষ্কার হয়েছিল। তালহা (রা.) বলেন, একবার হুজুর আলাইহিস্ সালাম এ দ্বারা হাত মোবারক পরিষ্কার করেছিলেন তখন থেকে এটাকে আগুন জ্বালায় না। মানুষ তো মানুষ প্রাণহীন বস্ত্রও শরীর মোবারকের ছোঁয়া পেয়ে প্রাণবন্ত হয়ে যায়। বারংবার দেখা গেছে- আল্লাহর অলিদের দেহের কাফনও দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও নষ্ট হয়না। যখন প্রাণহীন বস্তু অর্থাৎ, বস্ত্রাদির এইরূপ জীবন হতে পারে যে, মাটি ইস্পাতের মত কঠিন বস্তুকে গলিয়ে দেয় কিন্তু সাধারণ কাপড়কে গলাতে পারে না। তা হলে সৃষ্টির সেরা মানুষ তো প্রাণময় তার জীবন লাভ করা তো সহজেই অনুমেয়। এই তো কয়েক বছর পূর্বে বাগদাদে হযরত হোযায়ফা ইবনে য়ামান (রা.)'র পবিত্র মাযার খুলে তাকে স্থানান্তর করতঃ সালমান ফার্সী (রা.)'র কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। তখন জানা গেছে যে, জখমে (তাজা) রক্তের চিহ্ন রয়েছে এবং কাফন সেই রূপই অবিকৃত ছিল (যেইরূপ দাফনের সময় দেয়া হয়েছিল) এগুলো শিক্ষণীয় যে, তেরশ' বছরে কাফনের বস্ত্র গলেনি।

যদি এখনো ওলামা ও মাশায়েখদের মাধ্যমে নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী কারো নিকট পৌঁছে, তা হলে আনুগত্য ও সাড়া দেয়া অপরিহার্য। এইজন্য আযান শুনলে মসজিদে উপস্থিতি এবং হজ্বের মৌসুমে হারামাইন শরীফাইনে উপস্থিতি অপরিহার্য। এই হুকুম এক হিসেবে এখনো বহাল রয়েছে।

সহজে হাদীস

কিয়ামত পূর্ব দ্বীনি ইলম নিরিবিলি পাহাড়ের চূড়া এবং জলমগ্ন নীচু জায়গায় চলে যাওয়া প্রসঙ্গে

আল্লামা মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী রচিত
"আল্-মাযজান মিন মুখতাবিস্ সহীহাইন" ৩য় খন্ড হতে সংকলিত
অনুবাদ: উপাধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুল অদুদ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ. (رواه البخاري)

অনুবাদ: সৈয়্যদুনা হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এমন একটি সময় অতি সন্নিকটে যখন মুসলমানদের জন্য 'ছাগল' উত্তম সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে। তারা এগুলোকে নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় এবং বৃষ্টির পানি জমার স্থানে চলে যাবে। ফিতনা-ফাসাদ এবং সন্ত্রাস থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে দ্বীনকে রক্ষার যাবতীয় উপায় ও উপকরণ নিয়ে তারা ঐসব স্থানে চলে যাবে। [বুখারী শরীফ : কিতাবুল ঈমান]

ব্যাখ্যা: قوله خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ : ছাগলকে উত্তম সম্পদ বলে আখ্যায়িত করার পেছনে সম্ভবত রহস্য এই যে, ছাগলের বংশ বৃদ্ধি অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং তা বৈধ মালও বটে- যার মধ্যে হারামের লেশমাত্রও নেই। অধিকন্তু ছাগল (পশু) দ্বারা মালিকের ক্ষতির সম্ভাবনা খুবই কম। এ জন্য আম্বিয়ায়ে কেরামদের প্রায় সকলকে দিয়ে আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন 'ছাগল' লালন-পালন করিয়েছেন।

قوله شَعَفَ الْجِبَالِ : অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্বতের চূড়া ও উপত্যকার ন্যায় জায়গা সমূহে আশ্রয় নেয়ার জন্য লোকজন চলে যাবেন বলে যে উক্তি করেছেন তার অর্থ হচ্ছে- উক্ত জায়গায় জন কোলাহল থেকে নিরাপদে থাকা যায়। তবে নিজকে নিরাপদ ও কোলাহল মুক্ত জায়গায় নিয়ে যাওয়া প্রধান উদ্দেশ্য নয়। বরং শুধুমাত্র দ্বীনে ইলাহীকে সংরক্ষণের জন্যই উক্ত জায়গায় আশ্রয় নিবেন বলে ব্যক্ত করেছেন। পর্বত চূড়ায় ও জনশূন্য ময়দানে আশ্রয় নেয়া তখনই উত্তম যখন দ্বীনি পরিবেশ অনুকূল এবং বিপদমুক্ত নয়, তখন লোকজন থেকে দূরে থাকাই নিরাপদ। অনুরূপভাবে ফিতনা-ফাসাদের সময় যদি ফিতনা-ফাসাদকে দূর করার শক্তি থাকে তাহলে তা দূর করার চেষ্টা করতে হবে এবং প্রতিকূল অবস্থাকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে নচেৎ লোকালয় থেকে দূরে সরে যেতে হবে। مواقع শব্দটি বহুবচন, একবচনে موقع অর্থাৎ- বৃষ্টির পানি প্লাবিত ও বৃষ্টির পানি জমার স্থান।

فتن : قوله يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ এমন একটি শব্দ যার মধ্যে যাবতীয় কু-কর্ম অন্তর্ভূক্ত। এ হিসেবে হাদিসের অর্থ দাঁড়ায়- যখন এমন সময় আসবে যে, ধর্ম ও ঈমান বিপদের সম্মুখীন হবে, তখন এরূপ নির্জন জায়গায় গমন করে নিজের ঈমানকে রক্ষা করতে হবে। লোকালয় হতে দূরে চলে যাওয়া সম্পর্কে পাহাড়ের 'চূড়া'র উল্লেখ এজন্যেই করা হয়েছে যে, এসব জায়গা ফিতনা-ফাসাদ শূন্য এবং ওসব জায়গায় মানুষ নিজেকে ফিতনা-ফাসাদ থেকে মুক্ত রাখতে পারে।

بِدِينِهِ এর মধ্যে باء কে معيت এবং مصاحبت এর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ- স্বীয় দ্বীনকে নিয়ে চলে যাওয়া। যেমন- হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামের ঘটনায় فرثوبه এর মধ্যে পাথরটি হযরত মুসা আলাইহিস সালামের কাপড়টি নিয়ে চলে গিয়েছিল। ফিতনা-ফাসাদ এবং সন্ত্রাস হতে দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য শহর এবং জনপদ ত্যাগ করে গুহা ও পাহাড়ের চূড়ায় এবং উপত্যকায় চলে যাওয়া শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষ। আবু দাউদ এবং তিরমিযী শরীফের মধ্যে উল্লেখ আছে যে, কিয়ামত যখন অতি নিকটে আসবে তখন ফিতনা-ফাসাদ অন্ধকার রাতের মত ছড়িয়ে পড়বে, যেমন একজন লোক সকাল বেলায় মুসলমান হলে বিকাল বেলা পর্যন্ত ঈমান রক্ষা করা সম্ভব হবে না, অথবা সন্ধ্যা বেলায় মুসলমান হলে পরদিন সকাল বেলা পর্যন্ত ঈমান রক্ষা করা সম্ভব হবে না। অনেকেই নিজের ধর্ম এবং প্রতিজ্ঞায় অটল থাকতে পারবে না এবং বিভিন্ন প্রকারের বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে। এরূপে একই স্থানে অবস্থানকারী বিভিন্ন জায়গায় বিচরণকারী থেকে উত্তম বলে বিবেচিত হবে এবং ধীরে ধীরে চলাচলকারী দ্রুত চলাচলকারী থেকে উত্তম বলে বিবেচিত হবে।

অন্য হাদিসে আছে, এমন একটি যুগ আসবে ধৈর্য ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে জীবন যাপন করা অগ্নিশিখা স্পর্শ করার চেয়েও অধিক কষ্টকর হবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের বহু ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন, এ সব ভবিষ্যৎ বাণী দ্বারা বুঝা যায় যে, ফিতনা-ফাসাদের বিভিন্নতার দরুণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় ধর্মকে বিভিন্ন উপায়ে রক্ষা করার জন্য মুসলিম সমাজকে অবহিত করেছেন। কোন কোন সময় নিজের ঘরে স্থিরভাবে বসে থাকা, আবার কোন কোন সময় বড় শহর ছেড়ে ছোটখাট জনপদে গিয়ে নিঃস্পৃহ খেদমত আঞ্জাম দেয়াসহ যে কোন ধরনের অবস্থা সংগঠিত হওয়ার বিষয়ে এ হাদিসের মধ্যে ইংগিত করা হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, এটা লোকালয় ছেড়ে জনশূন্য জায়গায় সন্ন্যাসী হওয়ার শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য নয় বরং ঈমান ও ধর্মের প্রতিরক্ষাই মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে ধর্ম প্রচারের বিষয়টি সর্বদাই কৌশলে পরিচালনা করতে হবে। শেষ জমানায় দ্বীনি শিক্ষা ও তার উপকরণসমূহ পাহাড়, টিলা, উপত্যকা, জলাশয় ও অনুরূপ জলমগ্ন জায়গায় স্থাপন করা হবে। শহরে জীবন যাপন করা যখন দ্বীন ধর্মের প্রতিকূল হিসেবে পরিগতি হবে তখন ধর্মের প্রয়োজনীয়তার জন্য জীবন ধারণের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করাই উত্তম বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং দ্বীন ও দ্বীনের ইলম আল্লাহ তা'আলার এমন একটি দান হিসেবে গণ্য যাকে রক্ষা করার জন্য জনপদ থেকে মরুভূমিকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে। তবে এভাবে জনপদ ত্যাগ করা অপছন্দনীয়ও বটে। কোরআন মজিদে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আসহাবে কাহাফের ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ

অর্থাৎ: তোমরা গুহায় আশ্রয় নাও তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়া বর্ষণ করবেন। তাদের পলায়ন ফিতনা এবং সন্ত্রাসের কারণে সংগঠিত হয়েছিল। (সূরা কাহাফ-১৬)

উপরোক্ত হাদিস ও কুরআনের আয়াতসমূহ দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, শেষ জামানায় দ্বীনের ইলম এবং ঈমান বৃষ্টি অবতীর্ণ হওয়ার জায়গায়, জলাশয়, উপত্যকায় ও জঙ্গলে চলে যাবে। অন্য কথায় হযরত রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণীতে স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, দ্বীন ইসলাম ও ঈমানের প্রতিরক্ষা এবং ইলমে দ্বীনের খাঁটি চর্চার জন্য উত্তম জায়গা হল বৃষ্টি অবতীর্ণের স্থান তথা জলাশয়, উপত্যকা ও জঙ্গল।

অতএব প্রমাণিত হলো যে, এ ধরনের জায়গা বা স্থানেই তবলীগে দ্বীন এবং শিক্ষা-দীক্ষার কাজ পুরোপুরি আঞ্জাম দেয়া যেতে পারে। কেননা এ ধরনের এলাকা ফিতনা-ফাসাদ ও সন্ত্রাসমুক্ত। এ জন্যই বিশ্বের মহা মনীষীগণ এ ধরনের এলাকায় শিক্ষা-দীক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। কেননা এ সব এলাকা হাট-বাজার ও শহরের ন্যায় বিভিন্ন ধরনের ফিতনা-ফাসাদ এবং উচ্ছৃঙ্খল ও সন্ত্রাস মুক্ত হওয়ায় ছাত্ররা এরূপ অশোভনীয় কাজ থেকে দূরে থেকে প্রকৃত শিক্ষা-দীক্ষায় মনোনিবেশ করতে পারে।

এরই ধারাবাহিকতায় দ্বীন ও ধর্মের এ ক্রান্তিলগ্নে এবং বর্ণিত হাদীসের আলোকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ছিপাতলী জামেয়া গাউছিয়া মুঈনিয়া কামিল মাদ্রাসা এর স্বাক্ষর বহন করছে। কেননা এটা অত্যন্ত নীচু, জলাশয় ও জলমগ্ন এলাকা এবং অত্যন্ত নিরিবিলি ও কোলাহলমুক্ত মনোরম পরিবেশ সমৃদ্ধ এলাকায় অবস্থিত। যা লিখা-পড়া তথা দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের জন্য অত্যন্ত যুগোপযোগী। আল্লাহ সবাইকে হিফাযত করুন। আমীন!

বিশেষ প্রবন্ধ

রহমত, বরকত ও মুক্তিলাভের মাস মাহে রমজান

শাহজাদা আল্লামা আবুল ফছিহ মুহাম্মদ আলাউদ্দীন

রমজান আরবী মাসের ৯ম মাস। এই মাসটিকে আল্লাহপাক তাঁর বিশেষ ঐতিহাসিক কাজগুলো সম্পাদনের জন্যে নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন।

যেমন- এ মাসে খোদায়ী কিতাব তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিল নাজিল করেছেন। এ মাসেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল কোরআন নাজিল করেছেন। এই মাসে শবে কদর দিয়েছেন যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।

মানুষকে আল্লাহপাকের খাঁটি বান্দা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দিয়েছেন রোজা। মোট কথা আল্লাহপাক রহমত-বরকতের প্লাবন এনে দিয়েছেন এই মাসে। এ মাসে ইবাদতে এত বেশী সওয়াব যা অন্য মাসে নেই।

এই মাসটিকে রমজান নাম রাখার পিছনেও অনেক কারণ আছে। অবশ্য ভাষাবিদ ও মোফাসসেরিনদের মধ্যে এর অর্থ নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন, রমজান আল্লাহপাকের সিফতী নামের মধ্যে একটি। কারণ হযরত ইবনে মাসুদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলেপাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে রমজানকে রমজান বলতে নিষেধ করেছেন, তিনি আমাকে 'রমজান মাস' বলতে বলেছেন। আল্লাহপাক কোরআন পাকে শাহরু রামাজান অর্থাৎ রমজান মাস বলে উল্লেখ করেছেন।

এ মাসটি যেহেতু আল্লাহর মাস সেহেতু আল্লাহপাক তাঁর সিফতী নামের সাথে সম্পর্ক রেখে নাম দিয়েছেন রমজান মাস। কেউ আবার রমজানের ব্যাখ্যা অন্যভাবেও করেছেন। যেমন- রমজান শব্দটি রমজ মূল থেকে নেয়া হয়েছে। এর অর্থ উত্তপ্ত ভূমিতে পায়ে ফোস্কা পড়া, গরম পড়া। রামজাউ অর্থ রোদে তপ্ত ভূমি।

যেহেতু এই মাসে সূর্যের তাপে উটের বাচ্চার পা গরম হয়ে যায়। মরুভূমির বালি, পাথর গরম হয়ে যায় এ জন্য এই মাসটির নাম রাখা হয়েছে রমজান। গরম পাথরকেও রমজান বলা হয়ে থাকে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে এই মাসে মানুষের গোনাহগুলো জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

আখেরাতের চিন্তায়, আল্লাহপাকের আজাবের ভয়ে এবং এ মাসের ইবাদতের অশেষ সওয়াবের ঘোষণা শুনে মানুষের অন্তর স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে। যেমন গরমের দিনে সূর্যের তাপে মরুভূমি ও পাথর গরম হয়ে পড়ে।

হযরত খলিল (রহঃ) বলেন, রমজান শব্দটি রমজ থেকে নেয়া হয়েছে। রমজ এমন বৃষ্টিকে বলা হয় যা হেমন্তকালে বর্ষিত হয়। এই বৃষ্টির কারণে যেহেতু গাছপালা, তরুলতা, খেজুর বাগান সব কিছু তরতাজা হয়ে নতুন প্রাণ স্পন্দনে জেগে উঠে, তদ্রূপ এই মাসের কঠোর সাধনায় মানুষের শারীরিক ও মানসিক সমস্ত গোনাহ বিধৌত হয়ে মানুষ শিশুর মত পবিত্র হয়ে যায়। সেহেতু এই মাসের নাম রমজান রাখা হয়েছে। রমজান লিখতে পাঁচটি অক্ষর লাগে। এর প্রতি অক্ষরই একটি বিশেষ শব্দের প্রতি নির্দেশ করে। যেমন- 'রা'তে রেজা অর্থাৎ সন্তুষ্টি। 'মিম'তে মহব্বত অর্থাৎ আল্লাহপাকের ভালবাসা। 'জুয়াদ'তে জামিন অর্থাৎ আল্লাহপাক জামিনদার। 'আলিফ'তে উলফত অর্থাৎ বন্ধুত্ব। 'নুন'তে আল্লাহপাকের নূর বুঝায়। রমজান মাসে আল্লাহ বান্দার জন্যে এগুলো নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

সেহেতু এ মাসের নাম রমজান। রমজান হল আত্মশুদ্ধির মাস, ধৈর্যের মাস, সহানুভূতির মাস, কাম-ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য নামক ষড়রিপু বশীভূত করার মাস। রমজান রহমতের মাস, মাগফিরাতের মাস, দোযখ থেকে নাজাতের মাস।

রমজান আসে প্রতি বছর পাপ পংকিলতায় জর্জরিত মানবজাতিকে সীমাহীন রহমতের ছায়ায় চির শান্তির আবাস জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিতে।

রোজা কি ও কেন?

রোজা একটি ফারসী শব্দ। রোজার আরবী হল সওম। রোজা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি। সওম শব্দের আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। যেমন- আরবীতে বলা হয়, সামাতির রিহ, বাতাস থেমে গেছে। সামাতিল খাইল, ঘোড়া চলতে চলতে থেমে গেছে। মানুষও যখন কোন কাজ করতে করতে থেমে যায়, তখন আরবী পারিভাষায় তাকে বলা হয় সায়েম। শরীয়তের পরিভাষায় সওম বলা হয় সুব্হে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, পাপাচার ও কামাচার পরিহার করাকে। আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের এক দুর্লভ সুযোগ এনে দেয় এ মাসের সিয়াম সাধনা।

কেন এই সিয়াম সাধনা?

মানুষের মধ্যে যে পশু প্রবৃত্তি বা কুপ্রবৃত্তি রয়েছে, যেগুলো মানুষকে অন্যায় করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষের মধ্যে লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতাসহ সকল প্রকার পাপ জন্ম নেয়।

এই কুপ্রবৃত্তি থেকে আত্মরক্ষা তথা আত্মশুদ্ধি ও উন্নততর আদর্শের অনুসারী হওয়ার উদ্দেশ্যেই রমজানের রোজার বিধান দেয়া হয়েছে। মোটকথা মানুষ যেন কুপ্রবৃত্তিকে দমন করে শরীয়তের প্রতিটি বিধানকে যথাযথভাবে পালন করে যাবতীয় অকল্যাণকর কাজ থেকে আত্মরক্ষা করে আল্লাহপাকের অসীম রহমতের যোগ্য হতে পারে এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই রমজানে সিয়াম সাধনার বিধান দেয়া হয়েছে। রমজানের সিয়াম সাধনার গুরুত্ব যে কত বেশী- নিম্নের এই হাদীসে কুদসীর প্রতি লক্ষ্য করলেই বুঝা যায়। আল্লাহপাক বলেন, মানুষের প্রতিটি কাজের ফল আল্লাহপাকের দরবারে কিছু না কিছু বৃদ্ধি পায়। একটি নেক কাজের জন্য ১০ গুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত দেয়া হয়। অর্থাৎ তার চেয়েও বেশী কিন্তু আল্লাহপাক বলেন, রোজাকে এর মধ্যে গণ্য করা যাবে না। কারণ রোজা একমাত্র আমারই জন্য রাখা হয়, আর আমিই এর প্রতিফল দেব।

এই হাদীস দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল, প্রতিটি নেক কাজের জন্যই নেকী বৃদ্ধি করা হয় তার নিয়তের এখলাছের প্রতি দৃষ্টি রেখে। যে কাজে আন্তরিকতা বেশী তার মধ্যে নেকীও বেশী। তবে নেকীর একটি সীমা আছে কিন্তু রোজাই একমাত্র ইবাদত যার নেকীর কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই। আল্লাহপাক নিজে এই রোজার প্রতিদান দেবেন। আল্লাহপাক নিজে এর প্রতিদান দেয়ার অর্থ হল মানুষ শত ইবাদত করে এর প্রতিটিতে কিছু না কিছু রিয়া থাকে। যেমন- নামাজ পড়ার সময় রুকু, সেজদা করা, সূরা, কেরাত পড়া, অর্থাৎ মানুষ বুঝতে পারে যে, এই ব্যক্তি নামাজ পড়ছে। হজ্ব করার সময় লাখো মানুষের সাথে সফর করতে হয়। এক সাথে অনেক মানুষ তাওয়াফ করে, ছায়ী করে আরাফাতের ময়দানে হাজীরা দেয়, মিনাতে, মুজদালিফায় অবস্থান করে, কুরবানী দেয়, শয়তানকে পাথর মারে। এগুলো সবই মানুষ দেখে। জাকাত দিতে গেলেও মানুষ বুঝে ফেলে। অর্থাৎ প্রতিটি নেক কাজের মধ্যেই রিয়া আছে। নেই শুধু রোজার মধ্যে। কারণ রোজাদারকে দেখে বুঝার কোন উপায় নেই যে, সে রোজা রেখেছে। আর রোজা রেখে যদি গোপনে কিছু পানাহারও করে ফেলে, তা হলেও কেউ বুঝতে পারবে না যে, সে রোজা ভেঙ্গে ফেলেছে। রোজা রাখা হয় একমাত্র আল্লাহর ভয়ে এবং আল্লাহপাকের হুকুম পালন করার জন্য। এখানে লোক দেখানোর কিছু নেই। মানুষ রোজা এ জন্যে তরক করে না যে, মানুষকে যতই ফাঁকি দেয়া যাক না কেন আল্লাহপাককে ফাঁকি দেয়া যাবে না। আল্লাহপাক সর্বক্ষণ দেখেন ও শুনেন।

অন্য এক হাদীসে উল্লেখ আছে, আল্লাহপাকের নিকট সবচেয়ে প্রিয় বন্দেগী হলো রোজা।

কোন কোন মুহাদ্দেসীন এই হাদীসের এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, রোজা আল্লাহর গুণাবলীর অনুরূপ। কারণ আল্লাহপাকের গুণাবলীর মধ্যে- আল্লাহপাক পানাহার করেন না, পাপাচার, কামাচারসহ যাবতীয় প্রয়োজন থেকে মুক্ত, পবিত্র। মানুষ সারাদিন পানাহার, কামাচার ও পাপাচার থেকে বিরত থাকে। অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে।

আল্লাহপাক ঘুমান না এমনকি তন্দ্রাও তাঁকে স্পর্শ করে না। মানুষ রাতে তারাবিহ পড়ে, তাহাজ্জুদ পড়ে, সেহরী খায়। এভাবে কিছু সময়ের জন্য

হলেও নিদ্রা থেকে বিরত থেকে আল্লাহপাকের সিফাতের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। তাই আল্লাহপাক যখন দেখেন মানুষ আমার হুকুম পালন করছে, আমারই সিফাতে এখতিয়ার করার চেষ্টা করছে, তখন তাদের এই সদিচ্ছার প্রতি অবমূল্যায়ন করা যায় না। আমি নিজ হাতেই এই রোজার প্রতিদান দেব।

সিয়াম সাধনা সম্পর্কে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী

হযরত সালমান ফারসী (রা:) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শাবান মাসের ২৯ তারিখে এক খুতবা দান করেন, হে আমার উম্মতগণ, তোমাদের দ্বারপ্রান্তে একটি অতি বরকতময় মাস উপস্থিত। এ মাসে এমন একটি রাত আছে যে রাতে ইবাদত করলে হাজার মাসের ইবাদতের সমান সওয়াব পাওয়া যায়। আল্লাহপাক এই মাসে তোমাদের প্রতি রোজা ফরজ করেছেন।

যেমন- আল্লাহপাক বলেন, হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি রোজা ফরজ করা হয়েছে। যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি ফরজ ছিল। হয়ত তোমরা পরহেজগারী অবলম্বন করবে। (সূরা বাকারা-১৮৩)

এ মাসের রাতে ইবাদতে অধিক সওয়াব এনে দেয়। এই মাসের একটি নফল ইবাদত অন্য মাসের ফরয ইবাদতের সমতুল্য। এ মাসের একটি ফরজ ইবাদত অন্য মাসের সত্তরটি ফরজ ইবাদতের সমতুল্য। এই মাস সবর ও ধৈর্যের মাস আর ধৈর্যের প্রতিদান হল বেহেশত। এ মাস পরস্পর সদ্ব্যবহার এবং সকলের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের মাস। এ মাসে মুমিনের রিজিক বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। এ মাসে যে ব্যক্তি কোন রোজাদারকে ইফতার করাবে তার গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে এবং তাকে দোযখ থেকে নাজাত দেয়া হবে। এতে রোজাদারীর সওয়াবের কোন কমতি হবে না- এই খুতবা শুনে উপস্থিত সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সবাই তো রোজাদারকে ইফতার করাবার সামর্থ্য রাখে না। তখন প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন, শুধুমাত্র একটি খেজুর, একটু দুধ বা পানি দ্বারা ইফতার করানোই যথেষ্ট হবে। এই রমজানের প্রথম ১০দিন রহমতের, দ্বিতীয় ১০দিন মাগফিরাতের এবং তৃতীয় ১০দিন দোযখ থেকে নাজাতের। যে ব্যক্তি তার অধীনস্ত লোকদের প্রতি সদয় ব্যবহার করে তার গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

এ পর্যায়ে হযরত ইমাম গাজ্জালী (রহ:) রোজার তিনটি স্তরের উল্লেখ করেছেন-

১। পরম দয়ালু আল্লাহপাকের প্রেমে তন্ময় হয়ে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, কামাচার ও সকল প্রকারের পাপাচার থেকে বিরত থাকা।

২। পানাহার, কামাচার ও যাবতীয় পাপাচার থেকে বিরত থাকা।

৩। শুধুমাত্র পানাহার ও কামাচার থেকে বিরত থাকা। এটিকে তিনি রোজার সর্বনিম্ন স্তর বলেছেন আর এটি এ জন্য যে, একটি লোক রোজা রাখবে আর মিথ্যা বলবে, গুজনে ফাঁকি দেবে, মানুষের প্রতি জুলুম করবে, অন্যায় করবে, ঘুষ, দুর্নীতির সাথে নিজেকে জড়িয়ে রাখবে এতে করে রোজার পূর্ণ হক আদায় হয় না। রাসূলেপাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে রোজাদার মিথ্যা কথা বন্ধে অন্যান্য পাপাচার থেকে বিরত থাকে না তার পানাহার পরিত্যাগে আল্লাহপাকের কোন প্রয়োজন নেই। অবশ্য এই রোজায় আল্লাহপাকের হুকুম অমান্য করা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু সত্যিকার সওয়াব লাভের আশা করা যায় না।

ইমাম গাজ্জালী (রহ:) প্রথম যে স্তরের কথা বলেছেন এভাবে রোজা রাখলে আল্লাহপাক অগণিত সওয়াব দিবেন। সুতরাং এই রমজান মাসটিকে গণিমত মনে করে এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে, নিজের পাপকে ক্ষমা করিয়ে নিতে হবে। আর যদি এই সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও যিনি নিজেকে পাপমুক্ত করতে পারেনি তার মত দুর্ভাগা আর নেই। শুধু এইটুকু বলাতেই শেষ না- এমনকি এই দুর্ভাগার ধ্বংসের জন্য রাসূলেপাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও হযরত জিব্রাঈল (আ:) দোয়া করেন। যেমন- হযরত কাব ইবনে আজুবোহ (রা:) বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলেপাক (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে কদম রেখে বললেন, আমীন, দ্বিতীয় সিঁড়িতে কদম রেখে বললেন আমীন, তৃতীয় সিঁড়িতে কদম রেখে বললেন, আমীন। সাহাবায়ে কেরাম যখন এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি বললেন, আমি যখন মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে আরোহণ করছিলাম তখন হযরত জিব্রাইল (আ:) এসে এই দোয়া করছিলেন যে, 'যে ব্যক্তি রমজানের এই সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেও তার গোনাহগুলো ক্ষমা করিয়ে নিতে পারেনি তার ধ্বংস হোক'। আমি তখন তার সাথে এক মত হয়ে বললাম, 'আমীন'।

দ্বিতীয় সিঁড়িতে আরোহণ করার সময় তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তির নিকট রাসূলেপাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আলোচনা হয় এবং নাম বলা হয়, তখন সে, দরুদ পাঠ করে না তার ধ্বংস হোক'। আমি বললাম, 'আমীন'। তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখার সময় হযরত জিব্রাঈল (আ:) বললেন, 'যে ব্যক্তি পিতা-মাতা অথবা একজনকে বৃদ্ধ বয়সে পেয়েও তাদের সেবা-যত্ন করে জান্নাতের ব্যবস্থা করতে পারল না তার ধ্বংস হোক'। তখনও আমি বললাম, 'আমীন'।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা এটিই প্রমাণিত হল যে, রমজানের রোজা হল গোনাহ মাপের মাস, মাগফিরাতের মাস, চির শান্তি, চির মুক্তি লাভের মাস। হযরত ওমর (রা:) বলেন যে, আমি রাসূলেপাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি রমজান মাসে আল্লাহপাককে স্মরণ করে আল্লাহপাক তাকে ক্ষমা করে দেন। রমজান মাসে যে দেয়া করে সে মাহরুম হয় না'।

অন্য এক হাদীসে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি আন্তরিকতাবে সওয়াবের নিয়তে রোজা পালন করে আল্লাহপাক তার অতীত গোনাহসমূহ মাফ করে দেন। আর যে ব্যক্তি কদরের রাতে আন্তরিকতার সাথে সওয়াবের আশা নিয়ে ইবাদত করে আল্লাহপাক তার অতীতের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন'। (বোখারী, মুসলিম)

পূর্ববর্তী উম্মতের উপর রোজা ফরজ ছিল

সূরা বাকারার ১৮৩ নং আয়াতে আল্লাহপাক তিনটি কথা বলেছেন- (১) তোমাদের উপরে রোজা ফরজ করা হল। (২) তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরও রোজা ফরজ ছিল। (৩) যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার। রোজা ফরজ হওয়া সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এবার সামান্য আলোচনা দ্বিতীয় কথাটির উপর করা যেতে পারে।

আল্লাহপাক বলেছেন, আমি তোমাদের উপরই রোজা ফরজ করিনি পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও রোজাকে ফরজ করেছিলাম।

হযরত আদম (আ:) থেকে শুরু করে সমস্ত নবীদের, উম্মতদের উপরই রোজা ফরজ ছিল। যেমন- হযরত আলী (রা:) বর্ণনা করেন, আমি একদিন দুপুরে রাসূলেপাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। রাসূলেপাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন পবিত্র হুজরাতে অবস্থান করছিলেন। আমি তাঁকে ছালাম দিলাম। তিনি আমার ছালামের উত্তর দিলেন। পরে বললেন, হে আলী- হযরত জিব্রাঈল (আ:) তোমাকে ছালাম দিয়েছেন। আমি বললাম, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং তাঁর উপরও। এরপর রাসূলেপাক আমাকে নিকটে যেতে আহ্বান করলেন। আমি নিকট গিয়ে বসলাম। তিনি বললেন, এখন হযরত জিব্রাঈল (আ:) আমার পাশে আছেন এবং বলছেন যে, তুমি যদি প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখ তাহলে প্রথম রোজার পরিবর্তে তোমাকে দশ হাজার বছরের নফল রোজার সমান হওয়াব দেয়া হবে। দ্বিতীয় রোজার পরিবর্তে তোমার আমলনামায় ত্রিশ হাজার বছরের এবং তৃতীয় রোজার পরিবর্তে এক লাখ বছরের নফল রোজার সওয়াবের সমান সওয়াব লিখে দেয়া হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই সওয়াব কি শুধু আমারই জন্য, নাকি অন্য কার জন্যও? তিনি তখন এরশাদ করলেন, 'তোমার জন্য এবং তাদের জন্য যারা এটি পালন করবে'। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হে

রাসূলেপাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই রোজা আমি কোন দিন রাখব?'

তিনি এরশাদ করলেন, আইয়ামে বেজ অর্থাৎ প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে। হযরত আলী (রা:)কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, এই দিনগুলোকে আইয়ামে বেজ কেন বলা হয়? তখন তিনি বললেন, 'যখন আল্লাহপাক হযরত আদম (আ:)কে বেহেশত থেকে বের করে এই পৃথিবীতে থাকার জন্য নামিয়ে দিলেন, তখন সূর্যের তাপে তাঁর গায়ের চামড়া পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছিল। এরপর হযরত জিব্রাঈল (আ:) হযরত আদম (আ:)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি ইচ্ছা করেন যে, আপনার গায়ের রং সাদা/ফর্সা হয়ে যাক'? তখন তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। তখন হযরত জিব্রাঈল (আ:) বললেন, 'আপনি প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোজা রাখতে আরম্ভ করুন'। সুতরাং যখন হযরত আদম (আ:) প্রথম দিন অর্থাৎ ১৩ তারিখে রোজা রাখলেন তখন তাঁর গায়ের রং এক-তৃতীয়াংশ সাদা হয়ে গেল। পরের দিন অর্থাৎ ১৪ তারিখে রোজা রাখার পর দুই-তৃতীয়াংশ এবং ১৫ তারিখ রোজা রাখার পর সমস্ত শরীর সাদা হয়ে গেল। আর এ জন্যই এই দিনগুলোকে আইয়ামে বেজ বলে। 'বেজ' শব্দটি 'আর ইয়াজ' শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে। 'আর ইয়াজ' অর্থ 'সাদা'। এরপর থেকে হযরত আদম (আ:) প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোজা রাখতেন।

হযরত নূহ (আ:) এর উম্মত নাসারানের রোজা আমাদের মতই ১ মাস ছিল। তবে এই রোজা এক এক বছর এক এক সময়ে হত। কোন বছর শীতের সময় আবার কোন বছর গরমের সময় হত। এতে করে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচুর ক্ষতি হত। তখন নাসারাদের সমস্ত আলেম মিলে প্রতি বছর একই সময়ে নির্দিষ্ট করে নিল। এই পরিবর্তনের কারণ হতে নিজেরাই কাফফারা হিসেবে ১০টি রোজা বেশী করে ৪০ দিন করে নিলেন। এরপর একবার নাসারাদের বাদশার মুখে ঘা হল। বাদশা মানত করলেন যে, যদি আমার মুখের ঘা ভাল হয়ে যায় তাহলে আমি আমার রোজাতে আরও এক সপ্তাহ বাড়িয়ে দেব। বাদশাহর ব্যথা ভাল হয়ে যাবার পর তিনি এভাবেই রোজা রাখা আরম্ভ করলেন। এরপর তাঁর মৃত্যুর পর পরবর্তী বাদশাহ এসে ঘোষণা করে দিলেন যে, এখন থেকে বছরে ৫০ দিন রোজা রাখতে হবে। এভাবে প্রত্যেক নবীর উম্মতের জন্যই রোজা ছিল।

রাসূলেপাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর রোজার এই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রবিউল আউয়াল থেকে রমজান পর্যন্ত প্রতিমাসে তিন দিন করে রোজা ওয়াজিব ছিল। রাসূলেপাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আশুরার দিনও রোজা রাখতেন এবং সবাইকে রোজা রাখতে বলতেন।

তৃতীয় কথাটি হল যে, তোমরা যেন তাকওয়া অবলম্বন করতে পার। আর তাকওয়া আছে বলেই তো একটি মানুষ অসহ্য গরমে পিপাসার্ত হয়ে কলিজা ফেটে গেলেও এক ফোঁটা পানি পান করে না। ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ উষ্ঠাগত হলেও খাবারের একটি দানাও মুখে দেয় না। এর কারণ হল- আল্লাহপাকের ভয়। সে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহপাক তাকে দেখছেন, লুকিয়ে কিছু আহার করলে জগতের লোকেরা হয়তো দেখতে পারে না কিন্তু আলিমুল গায়েব আল্লাহপাককে কি ফাঁকি দেয়া যাবে? তাই ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা স্বীকার করেও শুধুমাত্র পরকালের ভয়ে এমন কোন কাজ করে না। যাতে রোজার সামান্যতম ক্ষতি হতে পারে।

প্রতি বছর এভাবে আল্লাহপাক বান্দাদের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। এ পরীক্ষায় মানুষ যত মজবুত হবে, ঈমান তার তত দৃঢ় হবে। মজবুত হবে।

একদিন নয়, দুদিন নয় সুদীর্ঘ এক মাস মানুষ এই কঠোর নিয়ম সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করে আত্মসংযমের এক মহান দৃষ্টান্ত তুলে ধরে।

রমজানের তুহফা শবে কদর

আল্লাহপাক রাসূলেপাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উম্মতের জন্য দিয়েছেন অত্যন্ত মর্যাদাবান একটি রাত। যে রাতে ইবাদত করলে এক হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও বেশী সওয়াব পাওয়া যায়।

এ রাত সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেন, আমি একে (কোরআন) কদরের রাতে নাযিল করেছি। শবে কদর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? শবে কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে প্রতিটি কাজের জন্য ফেরেস্তাগণ ও রূহ (জিব্রাঈল) অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশে। এটা নিরাপত্তা যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। (সূরা: কদর)

একবার বিভিন্ন নবীর উম্মতের অবদান সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। এ সময় একজন বললেন, বনী ইসরাইলের জনৈক এবাদতকারী সারা রাত ইবাদতে নিয়োজিত থাকত আর সকাল বেলায় জেহাদে বেরিয়ে পড়ত। এভাবে তিনি এক হাজার মাস পর্যন্ত ইবাদতে কাটিয়ে দেন। এ কথা শুনে অনেকে আফসোস করতে লাগলেন যে, আমরা তাদের মত আবেদ হতে পারছি না। কারণ আমাদের বয়সের গড় তাদের ইবাদতের সময়ের চেয়ে কম।

তখন আল্লাহপাক সূরা কদর নাজিল করে এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। বলে দিয়েছেন যে, তোমাদের কোন ভয় নেই, আমি তোমাদের জন্য এমন একটি রাত রেখেছি, যে রাতে ইবাদত করলে এক হাজার মাসের সমান সওয়াব তোমাদের আমলনামায় লিখে দেয়া হবে।

এ রাতে হযরত জিব্রাঈল (আ:) অগণিত ফেরেস্তা নিয়ে এই ধরাপৃষ্ঠে চলে আসেন এবং যাদেরকে দণ্ডায়মান ও বসা অবস্থায় নামাজ অথবা আল্লাহপাকের জিকিরে মগ্ন দেখতে পান তাদের প্রতি ছালাম এবং রহমতের জন্য দোয়া করেন। আর কাজটি সারারাত চলতে থাকে। এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, বলা হয়েছে এই রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এই হাজার মাসের মধ্যে তো বহুবার শবে কদর আসবে। আর এই প্রত্যেকটি রাতই হাজার মাসের চেয়ে উত্তম হবে। এভাবে হিসেব করলে রাতের সংখ্যা অনেক হতে পারে এক জনের জীবনে। আর মাস হয়ে দাঁড়াবে অসংখ্য। এর সরল উত্তর হল, যে হাজার রাতের চেয়ে শবে কদর উত্তম হওয়ার কথা বলা হয়েছে সেই হাজার রাতকে শবে কদর ভিন্ন অন্য সাধারণ রাতের হাজার সংখ্যা ধরেই এরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। অতএব, অসংখ্য বলার আর কোন অবকাশ থাকে না। যেমন- সূরা ইয়াসিন একবার পাঠ করলে ১০ বার কোরআন খতমের সমান সওয়াব পাওয়া যায়। তিনবার সূরা ইখলাছ পাঠ করলে, এক খতম কোরআনের সওয়াব পাওয়া যায়। এ স্থলে উত্তরের সারমর্ম এই হবে যে, সূরা ইয়াসিন ছাড়া বাকী কোরআন শরীফ দশবার পাঠ করলে যে সওয়াব হয় দশবার সূরা ইয়াসিন পড়লেও তেমনি সওয়াব হয়ে থাকে। আরও একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, বিশ্বের সকল স্থানে তো একই সময় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয় না। কাজেই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময়ে শবে কদর হওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। এরূপ অবস্থায় ফেরেস্তাদের অবতরণ ও বরকত নাযিল হওয়ার ব্যাপারে সময়ের নির্ধারণ কিভাবে হয়?

উত্তর হল, পৃথিবীর যে অংশে যখন রাত থাকে সে অংশে তখনই শবে কদরের বরকত দেয়া হয়। আর ফেরেস্তারাও সে অংশে তখনই অবতরণ ও অবস্থান করেন।

শবে কদর কোন রাতে? পবিত্র কোরআনের বর্ণনা মতে, শবে কদর রমজান মাসে হবে এটি প্রমাণিত। তবে সঠিক তারিখ বলা হয় নাই। রাসূলেপাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও তার সঠিক তারিখ বলে দেন নাই। তবে ওলামায়ে কেরামদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, শবে কদর রমজানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে অনুষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯তম রাতে হতে পারে।

এই পাঁচটি রাতের মধ্যে ২৭শে রমজান শবে কদর হওয়ার ব্যাপারে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম একমত। বিশ্বে সমস্ত মুসলিম দেশে ২৭ তারিখকে শবে কদর বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে অন্যান্য বেজোড় রাতগুলোকেও শবে কদর মনে করে ইবাদত করতে সমস্ত ওলামায়ে কেরামই বলেছেন। আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে রমজানের আদব রক্ষা করে আন্তরিকভাবে ইবাদত করার তৌফিক দান করুন। আমীন

বিশেষ প্রবন্ধ

পবিত্র লায়লাতুল ক্বদরের তাৎপর্য

এম,এম, মহিউদ্দীন

পবিত্র লায়লাতুল ক্বদর সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি পুণ্যময় ও বরকতপূর্ণ রজনী। বিশেষ করে মুসলিম জাতির কাছে এ রাত একটি অবিস্মরণীয় ক্ষণ। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে এ রজনীতে [illegible] মহান আল্লাহ তা'আলার রেসালাতের সম্পর্ক সূচিত হয়েছিল এবং তাঁর প্রতি পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল। সহীহ বোখারী শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা:) হতে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে, নির্জনতা [illegible] রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট প্রিয় হয়ে উঠলো। তিনি হেরা গুহায় চলে যেতেন এবং পরিবার-পরিজনের কাছে আসার পূর্বে তথায় একনাগাড়ে কয়েকদিন [illegible] কাটাতেন। এজন্য তিনি কিছু খাবার দাবার নিয়ে যেতেন। অবশেষে হেরা গুহায় থাকা অবস্থায় আকস্মিকভাবে তাঁর কাছে সত্যবাণী এলো। [illegible] ফেরেশতা তাঁর কাছে এসে বললেন, [illegible] পড়ুন। হযরত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) [illegible] বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, এরপর তিনি আমাকে ধরে খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন। এতে আমি প্রচন্ডরকম কষ্ট অনুভব করলাম। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন'। আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না। [illegible] বললেন, এরপর তিনি আমাকে [illegible] এবং [illegible] ইত্যাদি [illegible]

আমাকে ধরে তৃতীয়বার খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন। এবারও আমি অতীব কষ্ট অনুভব করলাম। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন; সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিন্ড হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত; যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না'। এরপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ আয়াতগুলো নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। এ সময় তাঁর কাঁধের গোশত ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল। খাদীজার কাছে পৌঁছেই তিনি বললেন, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর।" এভাবেই লায়লাতুল ক্বদরের রজনীতে হযরত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লাভ করেছিলেন পবিত্র কোরআনের বাণী। আর পবিত্র এ কোরআন হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) [illegible] রমজান মাসে নাজিল হয়েছে। [illegible] এ মাস বছরের অন্যান্য মাস অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশালী হয়েছে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, "শাহরু রমাদ্বানাল্লাযী উনযিলা ফিহিল কুরআনু হুদাল্লিন নাসি ওয়া বাইয়্যিনাতিম মিনাল হুদা ওয়াল ফুরক্বান" অর্থাৎ রমজান মাস, এই মাসে কোরআন নাজিল করা হয়েছে, এই কোরআন মানুষের জন্য [illegible] হেদায়েত ও [illegible] এই [illegible] এবং মীমাংসাকারী। [illegible] এছাড়া পবিত্র লাইলাতুল ক্বদরের ফজিলত বর্ণনা করতে [illegible] সূরা ক্বদর নাজিল করেন,

"ইন্না আনযালনাহু ফি লাইলাতিল ক্বদরি: ওয়ামা আদরাকা মা লাইলাতুল ক্বদরি; লাইলাতুল ক্বদরি খায়রুম মিন আল ফি শাহরি" অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আমি ক্বদরের রাত্রিতে কোরআন অবতীর্ণ করেছি; আর আপনার কি জানা আছে যে, ক্বদরের রাত্রি কি? ক্বদরের রাত্রি হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।"

এক বর্ণনায় জানা যায়, একদিন হযরত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে বণী ইসরাইলের চার ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, তারা ৮০ বছর পর্যন্ত একাধিক্রমে ইবাদত করেন। এ সময়ের মধ্যে একটি নাফরমানীও তারা করেন নাই।

তারপর হযরত আইউব, যাকারিয়া, খারকীল, ইউশা ইবনে নুহ (আ:) এই চারজন পয়গাম্বরের কথাও উল্লেখ করেন। এই হাদীস শুনে সাহাবায়ে কেরাম খুবই বিস্মিত হলেন। এমন সময় জিব্রাইল (আ:) হযরত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আগমন করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল' এর চেয়ে বিস্ময়কর বস্তু আল্লাহ আপনার উম্মতদেরকে দান করেছেন। অতঃপর তিনি সূরা 'ক্বদর' পাঠ করে বললেন, যে বিষয়ে আপনার সাহাবায়ে কেরাম বিস্মিত হয়েছেন, তা এর চেয়ে বিস্ময়কর। একথা শুনে নবীজি খুবই আনন্দিত হলেন।

এই ক্বদরের রাত রমজান মাসের শেষ তৃতীয়াংশের মধ্যে অনুসন্ধান করতে হবে। বিশেষভাবে সাতাশে রমজান। কারণ, বিভিন্ন ওলামায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসগণ রমজান মাসের শেষ দশ দিনের যে কোন বেজোড় তারিখে অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখের মধ্যে যেকোন দিন লাইলাতুল ক্বদর হতে পারে বলে অভিমত দিয়েছেন। এ সম্পর্কে ইমাম মালেক (রহ:) বলেন, রমজান মাসের শেষ দশদিন এক সমতুল্য- একের উপর অন্যের বেশি ফজিলত নাই। ইমাম শাফেয়ী (রহ:) বলেন, রমজানের একুশে রাত শবে ক্বদর। আবার কেহ বলেন, উনত্রিশে রাত। হযরত আয়েশা (রা:)ও বলেন, উনত্রিশে রমজান শবে ক্বদর।

আবু বুরীদাহ আসলামী বলেন, শবে ক্বদর তেইশে রমজান। আবু বকর ও হাসান (রা:) বলেন, পঁচিশে রমজান। বেলাল (রা:) হযরত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, শবে ক্বদরে চাব্বিশে রমজান। প্রমাণস্বরূপ বলা হয় যে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ:) তার সনদে ইবনে ওমর হতে বর্ণনা করেন, লোকদের অভ্যাস ছিল রমজান মাসের শেষ দশদিন হযরত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট তাদের স্বপ্নের কথা বর্ণনা করা। একবার হযরত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, তোমরা যে একটির পর একটি স্বপ্ন দেখেছ, তা সাতাশে রাতে সংঘটিত হয়েছে। অতএব, একথার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, শবে ক্বদর রমজান মাসের সাতাশ তারিখে সংঘটিত হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, ইবনে ওমর বলেছেন, শবে ক্বদর সম্বন্ধে আমি বেজোড় সংখ্যার মধ্যে চিন্তা করে দেখলাম, সাত সংখ্যাই অধিক প্রযোজ্য। কেননা, আসমানের সংখ্যা সাত, রাত সাতটি, সমুদ্রের সংখ্যা সাত, সাফা মারওয়া সাত বার দৌড়াতে হয়, সাত বার কাবাঘর তাওয়াফ করতে হয়, সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়, মানুষের সৃষ্টি সাতটি অঙ্গে, মানুষের আহার সাত দানা, মানুষের মুখমন্ডলে সাতটি ছিদ্র, সূরা ফাতিহায় সাতটি আয়াত, কোরআন মজীদের সাত কেরাত, সাত দোযখ, দোযখের দরজার সংখ্যা সাত, স্তরও

সাতটি, আসহাবে কাহাফের সংখ্যাও সাত, আদ সম্প্রদায় সাত রাতের বাতাসে ধ্বংস হয়েছে, হযরত ইউসুফ (আ:) সাত বছর জেল খেটেছিলেন, সূরা ইউসুফে বর্ণিত গাভীর সংখ্যা সাত, সে সময়কার দুর্ভিক্ষ সাত বছরই ছিল, আবার সাত বছর বিপুল পরিমাণ শস্যাদি উৎপাদিত হয়েছিল, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে সতের রাকাত ফরজ, কুকুর মাটির পাত্রে মুখ দিলে হযরত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাতবার ধৌত করার আদেশ দিয়েছেন, সূরা 'কদর'-এর সালাম পর্যন্ত সাতাশ অক্ষর, হযরত আইউব (আ:) সাত বছর পর্যন্ত নানাপ্রকার বিপদাপদে জড়িত ছিলেন, হযরত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে আয়েশা (রা:) এর সাত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। হযরত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমান, আমার উম্মতদের শহীদ সাত প্রকার। আল্লাহ তায়ালা সাত বস্তুর শপথ করেন: চন্দ্র, সূর্য, চাশতের সময়, দিন, রাত, আকাশ এবং যমীন যিনি সৃষ্টি করেছেন। বস্তুত: অধিকাংশ আলেম ও মুশতাহীদগণের অভিমত হলো, ২৭শে রমজান শবে কদর।

এ বরকতময় সম্মানীত রজনীতে এতিম-গরীব-মিসকিনদের মাঝে দান দক্ষিণা এবং নফল ইবাদত বন্দেগী করে নিজের কৃত গুণাহের জন্য ক্ষমা চেয়ে আল্লাহর হুজুরে রোনাজারি করা এবং তাঁর রহমত কামনা করা উত্তম। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, "তানাজ্জালুল মালায়িকাতু ওয়ার রুহু ফীহা বিইজনী রাব্বিহীম মিন কুল্লি আমরি। সালামুন হিয়া হাত্তা মাতলা ইল্ ফাজরি।" অর্থাৎ সেই রাতে ফেরেশতাগণ এবং রুহুল কুদ্দুস (জিব্রাইল) স্বীয় প্রতিপালকের আদেশে প্রত্যেক মঙ্গলময় বস্তু নিয়ে (পৃথিবীতে) অবতরণ করেন। (আর সেই রাত্রি) আগাগোড়া শান্তি। সেই রাত ফজর হওয়া পর্যন্ত (বরকতময়) থাকে।

যুগ যুগ ধরে সুফী সাধক, আওলিয়ায়ে কেরাম ও মু'মেন বান্দাগণ এই পবিত্র রজনী অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করে আসছেন। সুতরাং, পবিত্র মাহে রমজানে মহান আল্লাহ তাআলার দেয়া অসীম রহমত ও বরকতময় লাইলাতুল কদর যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা আমাদের সবার কর্তব্য। আল্লাহ আমাদের সবাইকে লায়লাতুল কদর সঠিকভাবে পালনের তাওফিক দান করুন। আমীন।

মাসিক

"আল্-মুবিন"

পড়ুন এবং আপনার সঙ্গীদের পড়তে উৎসাহিত করুন ও সুন্দর জীবন গড়ুন।

বিশেষ প্রবন্ধ

কোরআন হাদীসের আলোকে সমাজব্যবস্থা

মুহাম্মদ ওমর ফারুখ

মানুষ আল্লাহর সৃষ্ট জীবের মধ্যে সেরা জীব। এই মানুষকে আল্লাহ কেন বা কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন তা তিনি পবিত্র আল-কোরআনে উল্লেখ করেছেন, "আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। (জারিয়াহ-৫৫) এই ইবাদত কি জিনিস অর্থাৎ তার প্রকৃত স্বরূপ কি এ নিয়ে মুসলমানদের অধিকাংশের মধ্যে সঠিক ধারণা নেই। আর এটাই হল আমাদের প্রধান সমস্যা এবং সারা বিশ্বে মুসলমানদের নেতৃত্বহীন হয়ে লাঞ্ছিত হওয়ার প্রধান কারণ, অথচ মুসলমানদেরকে আল্লাহ সমস্ত মানব গোষ্ঠীর উপর নেতৃত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। কোরআন থেকেই এটির প্রমাণ করা যায়। যেমন আল্লাহ বলেন, "তোমরা মানব জাতির সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হবে। (বাকারা-১৪৩)। মুসলমানরাই হবে এমন আদর্শ স্থানীয়, সত্যের সাক্ষীস্বরূপ যাদেরকে অন্যান্য মানব সম্প্রদায় অনুসরণ করবে। অথচ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আজ মুসলমানরা সত্যের সাক্ষ্যদাতা না হয়ে নিজেদেরকে অন্যদের জন্য অনুকরণযোগ্য আদর্শ স্থানীয় রূপে প্রতিষ্ঠিত না করে বরং বিধর্মীদের জীবন যাত্রার বিভিন্ন দিক, তাদের রাজনৈতিক চিন্ত ধারা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও কর্মকান্ডকে অনুসরণ করে চলেছে। যাদের জীবন যাত্রা ও আদর্শ অন্যেরা নকল করবে তারাই আজ অন্যের জীবনযাত্রা ও আদর্শ নকল করে চলেছে। আল্লাহ বলেন, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব" (আলে ইমরান-১১০)। এই শ্রেষ্ঠত্বের আসন থেকে মুসলমানরা সরে আসার কারণ আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে আমাদের সৃষ্টি করেছেন আমরা সে অনুযায়ী কাজ করছি না। আমাদের অনেকেই আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে দিয়েছে, আর একটা বড় অংশ মনে করছে নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি শুধু ইবাদত। এগুলো বুনিয়াদী ইবাদত সন্দেহ নেই। কিন্তু ইবাদতের প্রকৃত অর্থ হলো, মুসলমান আল্লাহর বিধান ও নবীর তরীকা অনুযায়ী যা কিছু করবে সবই ইবাদত। এই আলোকে তার রাজনৈতিক কার্যকলাপ, সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত কার্যকলাপ সবই ইবাদত। এখন আমরা কোরআনের আলোকে পর্যালোচনা করব আল্লাহ এইসব বিষয়ে কি ধরনের বিধান দিয়েছেন যাতে করে মুসলমান হিসাবে দাবিদার ব্যক্তিরা তাদের নিজেদের চিন্তাভাবনা, কার্যকলাপ সম্পর্কে নিজেরাই বিচার করতে পারে। বলাবাহুল্য, আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এসব বিধান কার্যকর করে দেখিয়ে গেছেন।

পারিবারিক বিধানঃ আল-কোরআনে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে "পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের একেকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং কারণ পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে" (নিসা-৩৪) বস্তুত: এ আয়াতের এবং হাদীসের আলোকে ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষের উপর অর্পণ করে নারীকে এ কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তবে পুরুষ বা স্বামী অনুমতি দিলে স্ত্রী এমন প্রতিষ্ঠানে থেকে কিছু উপার্জন করতে পারে যা শিশুদের প্রতিষ্ঠান বা মহিলাদের প্রতিষ্ঠান, এমন কোনও প্রতিষ্ঠানে নয় যেখানে পুরুষ ও নারীর একত্রে সহ-অবস্থানের কারণে পর্দার ফরয পূর্ণাঙ্গভাবে মানা সম্ভব নয়। পরিবারের প্রধানকে পরিবারের সকল সদস্যদের দ্বীনী পরিচালক নিয়োগ কর। বলা হল: "হে মুমিনগণ, তোমরা নিজদিগকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। স্ত্রীকে

স্বামীগৃহের পরিচালিকার দায়িত্ব দেওয়া হলো (বুখারী, মুসলিম)। বিবাহকে সুন্নত হিসাবে ঘোষণা দিয়ে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যে এ সুন্নত থেকে দূরে থাকলো সে আমার দলভুক্ত নয়" (হাদীস)। পরিবারের সদস্যদের জন্য কোরআনে মীরাসী আইন তথা উত্তরাধিকারী আইন প্রবর্তন করা হলো।

অর্থনৈতিক বিধান: সুদকে হারাম ঘোষণা করা হলো। আল্লাহ সুস্পষ্ট ঘোষণা দিলেন, "যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। ইহা এ জন্য যে, তারা বলে বেচাকেনাও সুদের মত। অথচ আল্লাহ বেচাকেনাকে বৈধ ও সুদকে অবৈধ (হারাম) করেছেন" (বাকারা-২৭৫)। আরো বলা হলো, সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হও, যদি না ছাড় তবে জেনে রাখ ইহা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধ" (বাকারা-২৭৮)। সুদখোরদের জাহান্নামের খবর দিয়ে বলা হলো, "হে মুমিনগণ, তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেওনা, আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার এবং সেই আগুনকে ভয় কর যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে" (আলে-ইমরান-১৩০, ১৩১)। সুদের পরিবর্তে যাকাতের অর্থনীতি চালু করার ঘোষণা দেওয়া হলো এবং মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা বাস্তবায়ন করলেন।" তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও" (বাকারা-৪৩)। বস্তুত যাকাত আদায় ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারী দায়িত্ব। এ সম্পর্কে কোরআনের ঘোষণা- "আমি তোমাদিগকে (মোমেনদান্দা) রাষ্ট্রক্ষমতা তথা খেলাফত দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে, সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎকার্যে নিষেধ করবে (হাজ্জ-৪১)। আমরা কি এ সম্পর্কে ভাবি যে, সুদের অর্থনীতিতে আমাদের গোটা দেশ ডুবে আছে যা আল্লাহ হারাম করেছেন? এ সুদকে উচ্ছেদ করে যাকাতের অর্থনীতি চালু করা কি ঈমানের দাবী নয়? মুমিনের কাজ নয়?

আল্লাহ জুয়া, তীর নিক্ষেপ, ভাগ্য নির্ণয় হারাম করেছেন (মায়িদা-৯০)। অথচ আমাদের সমাজে লটারী, জীবন বীমা চালু আছে। পুতুল, প্রতিমা বেচাকেনা হারাম করা হয়েছে (বোখারী)। যা আমাদের সমাজে চালু আছে। দর বাড়াবার জন্য শুদামজাত করা হারাম করা হয়েছে (হাদীস)। যা পুরোপুরি চালু আছে। কোরআনে বলা হয়েছে "অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই" (বনি ইসরাইল-২৭) অথচ গরীব এই দেশটিতেও চারিদিকে অপব্যয়ের ছড়াছড়ি। সকল নবীরা মূর্তি ভেঙে ছিলেন। আর ১২ কোটি মুসলমানের এই দেশে কোটি কোটি টাকা স্মৃতিফলক ও মূর্তি তৈরীতে ব্যয় করা হয় সরকারীভাবে। কোরআনে আল্লাহ এই ধরনের কাজ সম্পর্কে বলেন, "তোমরা প্রতিটি উচ্চস্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করছো নিরর্থকভাবে" (শুয়ারা-১২৮)।

আইন ও বিচার বিধান: সমস্ত আইনের উৎস হল কোরআন ও সুন্নাহ। আল্লাহ বলেন, তোমার প্রতি কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে আল্লাহ তোমাকে যা জানিয়েছেন, সে অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর (নিসা-১০৫)। আরও বলা হলো, "তাহারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের বিচারের ভার তোমার (মুহাম্মদ) এর উপর অর্পণ না করে" (নিসা-৬৫)। তাগুতের বিচারকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য বলা হয়েছে, (নিসা-৬০)। এবং বলা হয়েছে কোরআন ও সুন্নাহ থেকে যারা মুখ ফিরায়ে নেয় তারাই মুনাফিক (নিসা-৬১)। সূরা মায়িদায় বলা হয়েছে- "আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন (কুরআন) সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না তারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী... জালিম... ফাসিক (আয়াত-৪৪, ৪৫, ৪৭)। চুরির শাস্তিবিধান সমূহে বলা হয়েছে, "পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তার হাত কেটে দাও, ইহা তাদের কৃতকর্মের ফল, আল্লাহর নির্ধারিত আদর্শ দন্ড" (মায়িদা-৩৮)। কেউ অন্যকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে তার জন্য হত্যার বদলার (কিসাস) বিধান দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, "হে মুমিনগণ,

নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে" (বাকারা-১৭৮)। বলা হয়েছে, কিসাসের মধ্যে জীবনের নিরাপত্তা আছে (বাকারা-১৭৯)। আর এই বিধান এই দেশে চালু না থাকার কারণে এক হত্যার পথ ধরে হত্যার সিলসিলা চালু হয়ে গেছে। কোরআনবিমুখ এই সমাজে কারো জীবনের আজ নিরাপত্তা নেই। কোরআনকে প্রত্যাখ্যান করে মানুষের তৈরী বিধান অনুসরণ করার কারণে সারাদেশ বিশেষ করে শিক্ষাঙ্গনগুলো হত্যার লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। অথচ এই দেশে শতকরা ৯০ জনই মুসলমান যারা কোরআনে বিশ্বাস করার কারণেই মুসলমান। মক্কার কাফেররা আল্লাহকে স্রষ্টা হিসাবে মানত এ কথা কোরআনেই বলা হয়েছে (লুকমান-২৫)। তবুও তারা কোরআন আর নবীকে না মানার কারণে মুসলমান হতে পারেনি-এ কথা কি আমরা ভেবে দেখেছি?

রাজনৈতিক বিধান: ইসলামে শাসন করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর (যুসুফ-৪০, ৬৭)। "সাবধান, সৃষ্টি যার, আইন চলবে তার (আরাফ-৬৫)। আল্লাহর বিধানকে মানতে হবে নবীর মাধ্যমে অর্থাৎ নবীর প্রদর্শিত পথে। নবী মজলিসে সূরার মাধ্যমে শাসন প্রবর্তন করেন। মানুষ আল্লাহর খলিফা এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ পরিচালনা করবেন। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কার্যকলাপের মূলনীতি হবে নিম্নরূপ: "তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী, কোনও বিষয়ে মতভেদ হইলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের (বিধানের) নিকট" (নিসা-৫৯)। রাজনীতির ভিত্তি হবে তিনটি জিনিষের উপর প্রতিষ্ঠিত তাওহীদ, নবুয়াত ও খেলাফত। তাওহীদের মর্ম হলো আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি স্রষ্টা, রিজিকদাতা, পালনকর্তা বিধানদাতা ইত্যাদি সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। আল্লাহ বলেন, "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁহারই।" (হাদীস-২), সুতরাং যারা জনগণের সার্বভৌমত্বের দাবীদার তারাই সার্বভৌমত্ব প্রশ্নে কুফুরী আকিদা পোষন করে। প্রকৃত শাসক আল্লাহই; কোরআনে আল্লাহ বলেন, "শাসন করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ (ইউসুফ-৪০)। নবুয়তের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি হেদায়াত গ্রন্থ আল-কোরআন যা অনুসরণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে, শুধু তেলাওয়াত করে ছওয়াব হাছিলের জন্য নয়। কার্যত অধিকাংশ লোক আজ কোরআনের হক আদায় অর্থ তেলাওয়াত ধরে নিয়েছে, কোরআন অনুযায়ী ব্যক্তি ও সমাজকে গড়ে তোলা নয়। নবুওয়াতের মাধ্যমে আর একটি জিনিষ পাওয়া যায় তা হলো সুন্নাহ যা কোরআনের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা তথা হাদীস। ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদ কোরআন আর সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত আর তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করা মুসলমানের জন্য ফরজে আইন। মানুষ হলো আল্লাহর খলিফা। "তিনিই (আল্লাহ) তোমাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন" আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুসারে মানুষ যখন বিধান দেয় তখনই সে হয় খলিফা অন্যথায় সে হয় যালেম, জনগণের প্রতি জুলুমকারী। আল্লাহ বলেন, "কিতাব (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী তাদের বিচার নিষ্পত্তি কর এবং তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ না কর" (মায়িদা-৪৯)। সুতরাং যারা আল্লাহর কিতাব অনুসরণ করছে না, তারা যে নিজেদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে নিজেরা বিভ্রান্তির মধ্যে আছে এবং মানুষদের বিভ্রান্তির শিকার করছে তা অত্যন্ত স্পষ্ট। নারী নেতৃত্ব সম্পর্কে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সে জাতি কখনোই কল্যাণ লাভ করতে পারে না যে জাতি নারীকে তাদের নেতৃত্বে বসায়।"

সামাজিক বিধান: এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের কোন বংশগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব নাই। সমস্ত মুসলমান একটি জাতি এবং সবাই ভাই ভাই। "মুসলিমগণ পরস্পর ভাই ভাই" (হুজরাত-১০)। "এক মুসলমান আর এক মুসলমানের ভাই" (মুসলিম শরীফ)। পর্দাকে ইসলাম ফরয করে দিয়েছে। "মুমিনদের বল, তারা

যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে" (নূর-৩০)। "মুমিন নারীদিগকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে"। আর আমরা এ সমাজে অফিস আদালতে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পুরুষ ও মেয়ের সহ-অবস্থান দেখতে পাই তা কোরআনের ঐ আয়াতের সুস্পষ্ট লংঘন। পুরুষ ও মেয়েদের প্রতিষ্ঠানগুলো আলাদা হতে হবে, যাতে শরীয়তের সীমার মধ্যে চলা সহজ হয়-এটাই ইসলামের বিধান। অন্যের গৃহে ঢোকার বিধান সম্বন্ধে বলা হয়েছে হে মুমিনগণ, তোমরা নিজনিগের গৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে গৃহবাসীর অনুমতি না হয়ে এবং সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না" (নূর-২৭)। আমাদের সমাজে তল্লাশীর সময় পুলিশ কর্তৃপক্ষের লোকেরা কতটুকু এ নিয়ম অনুসরন করে তা আমরা সবাই জানি। এছাড়া পরিবারের পরস্পরের হক, আত্মীয়ের হক, প্রতিবেশীর হক ইত্যাদি হক আদায়ের ব্যাপারে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুনির্দিষ্ট বিধান দিয়েছেন যা সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি।

কোরআনে বর্ণিত সমাজের যে রূপরেখা আমরা দেখতে পাই তার আলোকে আমরা স্পষ্টতই বুঝতে পারি আমাদের এ সমাজ চলছে জাহেলী নীতিতে। আমাদের নবীর নবুয়ত প্রাপ্তির আগে আরবের সমাজে মদ্যপ্রথা, সুদ, জুয়া, ঘুষ, যেনা পর্নোগ্রাফী অশ্লীলতা ইত্যাদি চালু ছিল এবং রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবুয়তের পর যে সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তুললেন যাতে উপরোক্ত জিনিসগুলো দূরীভূত হলো এবং একটি কল্যাণকর অনাবিল পরিবেশ সমাজ কায়েম হলো। খোলাফায়ে রাশেদীন এর আমলে সেই কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক শাসন চালু ছিল ইসলামের ইতিহাস তার সাক্ষী। মুসলমানরা যখনই কোরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক সমাজ কাঠামো ত্যাগ করে ইসলামের শত্রুদের মতবাদ নিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র চালানো শুরু করলো, নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করলো তখন তাদের জাতীয় জীবনে নেমে এল অশান্তি মারামারি হানাহানি, ক্ষমতার হানাহানি, সন্ত্রাস ইত্যাদি। আমাদের সমাজ জীবনে অশান্তির মূল কারণ কোরআন ও সুন্নাহকে রাষ্ট্রীয় জীবন তথা সমাজ জীবন থেকে দূরে নিক্ষেপ করে নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে শুধুমাত্র একজন ধর্মনেতা বা ধর্মপ্রচারক মনে করে মানুষের পবিত্র ধর্মানুভূতিকে বিভ্রান্ত করার জন্য ধর্মের কিছু কিছু জিনিস লেবেল হিসাবে ব্যবহার করা এবং এ কাজটি চতুরতার সাথে মুসলমান নামধারী শাসকরা করে আসছে। আমাদের দুনিয়ার জীবনে শান্তি এবং আখেরাতের জীবনে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার একমাত্র পথই হলো নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে গড়ে তোলা। আমাদের প্রত্যেককে হতে হবে দায়ী ইলাল্লাহ, আল্লাহর পথে আহ্বানকারী। দাওয়াত ও তবলীগের মাধ্যমে মানুষদের তাদের ব্যক্তিগত জীবনে ঈমান ও নেক আমল ওয়ালা হওয়ার জন্য যেমন উদ্বুদ্ধ করতে হবে তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রদর্শিত পথে কোরআনের যাবতীয় বিধিবিধান ও রসূলের সুন্নাহ অনুসরণ করার জন্য সকল মুসলমানকে আহ্বান জানাতে হবে- এ জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টাই হলো জিহাদ' ফি ছাবিলিল্লাহ আর এর বিনিময়ে সমস্ত গোনাহ মাফ করে চিরস্থায়ী জান্নাতের ওয়াদা করেছেন মহান আল্লাহ তাআলা। "তোমরা আল্লাহ তাঁহার রসূল এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং ধন ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা বোঝ। আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন ও জান্নাতে দাখিল করবেন যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত।

বিশেষ প্রবন্ধ

একবচনের দেশ

মুহাম্মদ ওহীদুল আলম

মানুষ অর্থনৈতিক জীব

সমাজ বিজ্ঞানের সে সংজ্ঞাটি বোধহয় পাল্টে গেছে। মানুষ আর সামাজিক জীব নয়। সে হয়ে পড়েছে একান্তভাবে অর্থনৈতিক জীব। টাকা পয়সাই হয়ে পড়েছে তার চিন্তাচেতনা ও কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু। তার চোখ হয়তো চারিদিকে ঘোরে কিন্তু মন থাকে টাকার সূতোয় বাঁধা। সামাজিক কাজকর্মেও সে তার লাভ লোকসানের কথা ভাবে। বাবা চায় তার সন্তানের আয় আরো বাড়ুক। ছেলে চায় বাবা তাকে আরো টাকা এনে দিক। স্ত্রী চায় তার স্বামী পরিণত হোক আস্ত একটা টাকার মেশিনে। শ্বশুর হিসেব করে মেয়ে জামাইর উপরি পাওনা কতটুকু। মেয়ে জামাই ভাবে শ্বশুরের কয়টা বাড়ি। শিল্পপতি ভাবে মুনাফার অঙ্ক এবার স্ফীত হবে কত বেশি। আমলা ভাবে এবার ঘুষের আমদানি হবে কেমন। মেজবান ভাবে মেহমানের উপহারের ঝুড়ি কত বড়, মেহমান ভাবে টেবিলে খাবারের আইটেম কত বেশি।

এক দফা এক দাবি

মানুষের এখন একমাত্র চাহিদা গতকাল যা পেয়েছি আজ পেতে হবে তার চেয়ে বেশি। তাই তার দাবি; গতকাল যা দিয়েছ আজকে দিতে হবে তার চেয়ে বেশি। গতকাল যে ভাড়ায় যতটুকু পথ গিয়েছ আজ আর সে ভাড়ায় ততটুকু পথ অতিক্রম করা যাবে না। গত বছর যে ভাড়ায় যে বাসায় মাসযাপন করেছ এ বছর সে ভাড়ায় সে বাসায় রাতযাপন করা যাবে না। গতমাসে ঔষধ কিনেছ যে দরে এ মাসে ভুলে যাও সে দরের কথা। গতবার যে ফি-তে পাওয়া গেছে উকিল ডাক্তারের সেবা এবারে সে ফি-এর কথা ভুলে যাও দয়া করে।

আরো চাই, আরো চাই

এটাই এখন মানুষের প্রিয় স্লোগান। গ্রামে বাড়ি থাকলে চলবে না শহরেও চাই অন্য একটা। চট্টগ্রামে বাড়ি আছে তাতে কী, ঢাকাতেও একটা না হলে চলে না। গাড়ি একটা থাকলে আরেকটা থাকতে অসুবিধা কী? আমার দশটা থাকলে কী হবে আমার প্রতিবেশির যে বিশটা আছে! শফিক কেন মেম্বার হয়ে সন্তুষ্ট থাকবে রফিকতো ইতোমধ্যে চেয়ারম্যান হয়ে গেছে। এমপি হয়ে কেন আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে বলো, আমিতো এখনো মন্ত্রী হতে পারি নি!

তুমি গোল্লায় যাও আমি বেঁচে থাকি

অন্য কারো কথা ভাবার সময় নেই এখন মানুষের। আত্মচিন্তাই এখন মানুষের প্রধান অবলম্বন। অন্যের ঘাড়ে যদি পা রেখে উপরে উঠা যায় তাতে কোন দোষ খুঁজে পায় না সে। নিজের ইমারত আকাশচুম্বী হোক এটাই শুধু চায় সে, প্রতিবেশির আরো হাওয়া বন্ধ হওয়ার ক্ষতিকর পরিণতি নিয়ে ভাববার ফুরসৎ নেই তার।

বন্ধনের গ্রন্থি

অন্যের স্বার্থহানি ঘটিয়ে নিজের টিকে থাকার এ প্রবণতা মানুষের মাঝে বন্ধনের গ্রন্থিগুলো শিথিল

করে দিয়েছে। মানুষের দুঃখ কষ্টে মানুষ এখন আর তেমন সমবেদনা অনুভব করে না। প্রতিবেশি, আত্মীয়স্বজন এমনকী নিজ পরিবারের সদস্যদের প্রতিও যেন আত্মার বন্ধনের নিবিড়তাকে লালন করতে চাইছে না। মানুষ ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিকতায় সংকুচিত হয়ে পড়ছে। এ সংকোচন বিস্তার ঘটাচ্ছে পারস্পরিক হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা ও সন্দেহ।

এসবই যদি হয় ব্যক্তির মানস গঠনের উপাদান তাহলে সমাজে হত্যা, গুম, অপহরণ ও খুনের প্রাদুর্ভাব ঘটে মহামারি আকারে।

নীতি ও নৈতিকতার উৎখাত

এর ফলে মানুষের মন থেকে উৎপাটিত হয়ে গেছে নীতি ও নৈতিকতার সকল উপাদান। লক্ষ্য যখন সম্পদ আহরন নীতি নৈতিকতার প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। সত্যরক্ষায় স্বার্থরক্ষা হয় না। স্বার্থরক্ষায় তাই সত্যকে বিসর্জন দেয়া সহজ হয়ে পড়েছে মানুষের কাছে। বাস্তববুদ্ধিতেই মানুষ জেনে ফেলেছে চরিত্রবান হতে গেলে ধনবান হওয়া যায় না। তাই চরিত্রের চেয়ে ধনের কদর বেশি সমাজে। সে ধনের ভেতরের চেহারা যতই কদর্য হোক না কেন এর বাইরের রূপটি বরাবরই উজ্জ্বল।

নিস্তব্ধ বিবেক

মানুষের বিবেক এখন যেন কোন এক ঘুম পাড়ানিয়া গানের সুরে মুগ্ধ হয়ে কুম্ভকর্ণের মত ঘুমিয়ে পড়েছে। সমাজে অন্যায় জোর জুলুম জোচ্চুরি হত্যা ছিনতাই রাহাজানি লুণ্ঠন অমানবিকতার সয়লাব বয়ে চললেও মানুষের বিবেক আজ বিচলিত হয় না। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে ভুলে গেছে মানুষ। ক্ষমতা কথা বলে এখন অস্ত্রের ভাষায়। চারিদিকে মিথ্যার নিশান ওড়ে। এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে বিপদে পড়তে চায় না মানুষ। কারণ অপরাধীরাই এখন সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে।

পেশার নাম খুন

আধুনিক সমাজে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে মানুষ বিচিত্র পেশাকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু পেশা হিসাবে "খুন" কে গ্রহণ করা সমাজের পচনশীল তার চূড়ান্ত লক্ষণ। শুধু টাকার বিনিময়ে মানুষকে খুন করে ফেলার এ পেশা একেবারেই অভিনব। সমাজে সৃষ্টি হয়েছে এক ঘাতক শ্রেণী। কারণ এ শ্রেণীকে ব্যবহার ও লালন করার ব্যাপক শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি আমাদের দেশে বহাল আছে। দেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর একটি অংশও এ ঘাতকশ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়েছে। কারণ নির্বিঘ্নে কাজ করার সরঞ্জাম, সুযোগ ও নিরাপত্তা তাদের বেশি। মানুষের কাছে একেবারেই অসহ্য হয়ে উঠেছে 'প্রতিপক্ষ'। তাই শুরু হয়েছে প্রতিপক্ষকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার জোর সফলতার মুখ দেখে তবে আর পেছনে থাকাতে হবে না। নো রিস্ক নো গেইন। ভাবখানা এই: 'প্রতিপক্ষ' যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাহলে ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, আধিপত্য ও অর্থ অর্জনের রাজপথ অবারিত হয়ে যাবে।

টাকার দাসত্ব করছে সবাই

দাসপ্রথা নাকি পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বহু পূর্বেই। কিন্তু ছদ্মবেশে ও প্রবল বেগে ফিরে এসেছে নবতর এক দাসত্ব প্রথা। মানুষ করছে এখন পুঁজির দাসত্ব। এ দাসত্বের এমন এক মহিমা যে, মানুষ একে 'প্রভুত্ব' ভাবতে ভালবাসে। আইন, প্রশাসন, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং সাংবাদিকতা সকলই এ পুঁজির দাসত্ব করছে। জ্বরের রোগী যেমন গায়ের ওপর কম্বলের পর কম্বল চাপায় জ্বারাগ্রস্ত আমাদের এ সমাজ এখন গায়ের ওপর চাপাতে চাচ্ছে টাকার বহুস্তর বিশিষ্ট চাদর। আশঙ্কা জাগছে একদিন ভূমিকম্পে দেয়ালচাপা জনবস্তির মত অবস্থা হতে পারে এ সমাজের।

মিস্ত্রি, টেকবাজ ও মালিক

না, আপনারা যা ভাবছেন তা নয়। এ 'মিস্ত্রি' কোন বিগড়ে যাওয়া যন্ত্রের মেরামতকারী কারিগর নয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে একটা শ্রেণী আছে যারা জনসাধারণের পকেট মারে। তারা একটা সংঘবদ্ধ শ্রেণী। তাদের আবার রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের মত গডফাদারও আছে। তিনভাগ হয়ে তারা কাজ করে। গণপরিবহনে বা অন্য কোন স্থানে যে প্রথমে মানুষের পকেট মারে তাকে বলা হয় 'মিস্ত্রি'। যারা বাসে যাত্রীদের চাপ দেয় বা জটলা পাকায় তাদের বলা হয় 'টেকবাজ'। পকেট মারার পর যাদের কাছে মালামাল জমা করা হয় তাদের বলা হয় 'মালিক'। বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি এখন এরকম "মিস্ত্রি, টেকবাজ ও মালিকদের" খপ্পরে পড়েছে। নানা কৌশলে তারা বাংলাদেশের জনগণের পকেট মারে। বিগত ৪০ বছরে বাংলাদেশে সরকারিভাবে প্রায় আড়াই লাখ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণ অনুদানের শতকরা ৭৫ ভাগ লুণ্ঠন করেছে দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতির এসব "মিস্ত্রি, টেকবাজ ও মালিক" রূপী এ দুর্বৃত্ত গোষ্ঠী।

প্রভাবশালী মহল

সব কিছুর পেছনে রয়েছে 'প্রভাবশালী মহল'। ছোটবেলা থেকে প্রভাবশালী মহলের কথা শুনে আসছি। আর শুনে আসছি 'উপরের নির্দেশের' কথা। 'বিমানবন্দরে চোরাচালানী ধরা পড়ার পর প্রভাবশালী মহলের চাপে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে পুলিশ' এমন কথা আমরা বরাবরই শুনে আসছি। এ প্রভাবশালী মহলের কোন নাম সাকিন কখনো উল্লেখ করা হয় না। তাই তাদের লজ্জাবোধের কোন কারণ ঘটেনা। সম্মানহানিরতো প্রশ্নই উঠে না। "কেন আপনি/ আপনারা এমন (অন্যায়) কাজ করলেন?' এমন প্রশ্নের জবাবে প্রায়ই বলতে শুনি: 'উপরের নির্দেশে আমরা এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছি। আমরা হচ্ছি হুকুমের গোলাম'। "তাহলে আইন, ন্যায় পরায়ণতা, সুবিচার ইত্যাদির কী দশা?" না এসব হচ্ছে দুর্বলকে শাস্তি ও সবলকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য।

উপরের নির্দেশে থানা থেকে সন্ত্রাসী খুনিকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এমন তথ্যে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা ভরপুর। অভিযুক্ত আসামী চোখের সামনে ঘুরে বেড়ালেও তাকে গ্রেপ্তার করা হয় না। কেননা এ ক্ষেত্রে 'উপরের নিষেধ' আছে।

ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে

প্রতিটি সঙ্কটে গুণীজনদের মুখে শুনে আসছি 'দেশ এখন ক্রান্তিকাল অতিক্রম' করছে। যাত্রা থেকেই চলছে এ অতিক্রমের পালা। কিন্তু এ ক্রান্তিকালের কোন শেষ হয় না। বিষাক্ত চক্রের মত ক্রান্তি কালের এ গোলকধাঁধায় আমাদের জীবন ঘুরপাক খায়। ইনসাফের নিশানা উড়িয়ে কোন রাষ্ট্রনায়কের আবির্ভাভ ঘটেনা।

সুবচন নির্বাসনে

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ নামে নাটক হয়েছিল। শুধু সুবচন নয় এ দেশ থেকে যে বস্তুটি একবারে নির্বাসিত হয়ে গেছে তার নাম "ইনসাফ"। গণপ্রজাতন্ত্রী নামে এদেশ অভিহিত। বহুজনের এদেশ। আসলে এটা এখন কোন 'বহুবচনের' দেশ নয়-এটা পরিণত হয়েছে একবচনের দেশে।

প্রবন্ধ

কারো সীমাতিরিক্ত প্রশংসা না করা

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন

কোন ওলী-বুযর্গ বা আলিম-ওলামা বা যে কোন ব্যক্তির যৌক্তিক ও সংগত পরিমাণে প্রশংসা করা, প্রকৃতপক্ষে এটা প্রশংসাকৃত ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষ্য দেয়া- যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য এবং তার সাদৃশ্য-অসাদৃশ্য সকল পরিপূর্ণতার মতামত ব্যক্ত করা। ফলে এর মধ্যে এটাও ভয় রয়েছে, প্রশংসিত ব্যক্তির মধ্যে অহংকার ও আত্মপূজারীর মত বিধ্বংসী ব্যাধিতে সংক্রমিত হওয়ার আশংকা বিদ্যমান। এ জন্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। দেখুন! এ ব্যাপারে হুযূর সৈয়্যদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী ও শিক্ষা কী?

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ ثَلَاثًا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلَانًا وَاللهُ حَسِيبُهُ إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا.

অনুবাদঃ হযরত আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে এক সাহাবা অন্য সাহাবার প্রশংসা করেন (প্রশংসাটি যুক্তিসংগত বিহীন এবং যাতে সাবধানতা অবলম্বন করা হয়নি)। তৎক্ষণাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি স্বীয় মুসলিম ভাইয়ের এভাবে প্রশংসা করে তার ঘাড় কেটে দিয়েছ (এমন কাজ করেছ যাতে সে ধ্বংস হয়ে যায়)। একথা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বলেছেন। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে যে কোন কেউ অন্য মুসলিম ভাইয়ের প্রশংসা করা জরুরী এবং তাকে ঐ প্রশংসার উপযোগী মনে করো তাহলে এরকম বলবে, অমুক ভাইয়ের ব্যাপারে আমি এরকম মনে করি অথবা তার ব্যাপারে আমার খেয়াল ও অভিমত এ রকম। তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই সমধিক পরিজ্ঞাত। কারো পবিত্রতা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহর ওপর কারো পবিত্রতার হুকুম লাগানো উচিত নয়। অর্থাৎ- কারো সম্পর্কে এমন মন্তব্য বা কথা-বার্তা না বলা সে কোন ধরনের সন্দেহ ছাড়া নিশ্চিতরূপে আল্লাহর নিকট পুতঃপবিত্র। কেননা এটাই হলো আল্লাহর হুকুম আরোপ করা কোন বান্দার জন্য এরকম কোন অধিকার নেই। পরিতাপের বিষয়, বর্তমান যুগে আমাদের দ্বীনি সভা সেমিনারেও এরূপ সীমালঙ্ঘন করা হচ্ছে। আল্লাহ হিফাযত করুন।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে হযরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে,

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ، فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ»

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমরা প্রশংসায় সীমালঙ্ঘনকারীদের দেখবে, তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করবে।

এ হাদীসে مَدَّاحِينَ দ্বারা অধিকাংশ ঐ সমস্ত লোকদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, যারা লোকদেরকে চাটুকারিতা ও তোষামোদের ভিত্তিতে প্রশংসা করে।

এ হাদীসে বলা হয়েছে, যখন এ ধরনের লোকের সাক্ষাৎ হয় এবং তোমাদের সামনে সীমাতিরিক্ত প্রশংসা করে, তখন তাদের মুখে মাটি ঢেলে দেবে। অথবা এর মর্মার্থ এই যে, অসন্তুষ্টি প্রকাশার্থে তাদের মুখে বাস্তবিক পক্ষে মাটি ঢেলে দেয়া বা তাদের কোন ধরনের পুরস্কার ও সম্মান না দেয়াই হলো তাদের মুখে মাটি ঢেলে দেয়া বা তাদের কিছু না দিয়ে বঞ্চিত করে ফিরিয়ে দেয়া বা একথা বলা, তোমাদের মুখে মাটি- এভাবে বলাই হলো তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করা।

হযরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে অন্য একটি রিওয়ায়েত আছে। একদা এক ব্যক্তি হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপস্থিতিতে সামনা-সামনি তাঁর প্রশংসা করলেন, তখন তিনি এ হাদীসের ওপর আমল করতে গিয়ে জমি থেকে মাটি নিয়ে তার মুখে নিক্ষেপ করলেন।

যদি ভাল নিয়ত বা কোন ধর্মীয় যুক্তিসিদ্ধতায় কোন ব্যক্তি আল্লাহর সত্য ও বাস্তব প্রশংসা তাঁর সামনে বা পিছনে করা হয় এবং এ ভয়ও যদি থাকে যে, তিনি অহংকার এবং স্বীয় ব্যাপারে ভুল উপলব্ধিতে পতিত হবেন না, তাহলে এ ধরনের প্রশংসার প্রতি নিষেধাজ্ঞা নেই বরং ভাল উদ্দেশ্যের কারণে উত্তম প্রতিদান পাবে। স্বয়ং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন সাহাবায়ে কিরামের এবং কোন কোন সাহাবা অন্যান্য সাহাবীদের যে প্রশংসা করেছেন তা এ ভিত্তিতেই করেছেন।

কবিতা ও কবিত্বের ব্যাপারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, কবিতা কি সম্পূর্ণরূপে মন্দ ও খারাপ? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এ রকম নয়। যদি কবিতার বিষয়বস্তু খারাপ হয় তাহলে তা খারাপ, আর বিষয়বস্তু ভাল হলে তা ভাল। তিনি এটাও বলেছেন, কোন কোন কবিতা তো বড়ই বিজ্ঞতাজনিত ও প্রজ্ঞাময় হয়। তিনি বলেন, কবিতাও বাক্য। এর মধ্যে যা ভাল তা-ই উত্তম। যা খারাপ তা-ই মন্দ।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে-

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً.

অর্থাৎ- হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিছু কবিতা স্বীয় বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে সরাসরি প্রজ্ঞাময়।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে-

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهَ بَاطِلُ». (متفقٌ عَلَيْهِ)

অর্থাৎ- হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কবিরা কবিতায় যা বলেছেন তন্মধ্যে সবচেয়ে সত্য কথা হলো কবি লবিদ বিন রবিয়ার এ পংক্তি- أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَاللهَ بَاطِلُ অর্থাৎ- সাবধান! আল্লাহ ছাড়া প্রত্যেক বস্তু অসার ও ধ্বংসশীল।

কবি লবিদ জাহেলী যুগের একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ চরণকে পৃথিবীর সমস্ত কবিদের কবিতা থেকে সত্য উক্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা এটা কুরআন পাকের এ আয়াতের সমার্থক। এ কবিতার দ্বিতীয় পংক্তি হলো-

وَكُلُّ شَيْئٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ.

অর্থাৎ: এখানের সমস্ত নি'য়ামত একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে।

এ কবিতা জাহেলী যুগের। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইসলাম গ্রহণ করার তাওফীক দান করেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি কাব্য চর্চা একেবারে ছেড়ে দেন এবং বলেন, يَكْفِيْنِي اَلْقُرْآنُ অর্থাৎ- কুরআন মজিদই আমার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ পাক তাকে দীর্ঘ জীবন দান করেছেন। তিনি হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর খিলাফতকালে ১৫৬ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে হযরত 'আমর ইবনে সারীর রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় পিতা সারীর ইবনে সুয়াইদ সাক্বফী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে তাঁর সওয়ারীতে আরোহী ছিলাম। তিনি আমাকে বলেন, তোমার কি উমাইয়া বিন আবিস্ সালত এর কিছু কবিতা স্মরণ আছে? আমি আরয করলাম, হ্যাঁ স্মরণ আছে। তিনি বললেন, তাহলে শুনাও। আমি একটি শ্লোক তাঁকে শুনালাম। তিনি বললেন, আরো শুনাও। অতঃপর আমি তাঁকে ১০০টি শ্লোক শুনালাম।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে-

لَقَدْ كَادَ يَسْلِمُ شِعْرُهُ.

অর্থাৎ- উমাইয়া স্বীয় কবিত্বে ইসলামের অনেক নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল।

অন্য আরো একটি বর্ণনায় এসেছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উমাইয়া বিন আবিস্ সালতের কবিতা শুনে বললেন,

آمَنَ شِعْرُهُ وَكَفَرَ قَلْبُهُ.

অর্থাৎ- তাঁর কবিত্ব মুসলমান হয়েছে কিন্তু তার অন্তর কাফির রয়ে গেছে।

উমাইয়া বিন আবিস্ সালত সাক্বফী জাহেলী যুগের কবি ছিলেন। কিন্তু তার কবিতায় ধার্মিকতা ছিল। এ জন্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কবিতায় হৃদয়ের প্রশান্তি অনুভব করতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্বন্ধে বলেছিলেন, সে তার কবিত্বে ইসলামের অনেক নিকটবর্তী হয়েছিল। অর্থাৎ- তার কবিত্ব মুসলমান হয়েছে কিন্তু তার অন্তর কাফির রয়ে গেছে।

উমাইয়া রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যমানা পেয়েছিল এবং তার কাছে দ্বীনের দাওয়াতও পৌঁছে ছিল কিন্তু তার ঈমান নসীব হয়নি।

মদ্যপান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

এম,এম ইয়াছিন হোসাইন

মদের নিষিদ্ধতার ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তে দৃঢ় মীমাংসা ও ফয়সালা রয়েছে। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে কঠোর পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। যা অসংখ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ সম্বন্ধে সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন হাদীস বিদ্যমান। এ ব্যাপারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ঐশী বার্তা এসেছে, আপনার উম্মত মদ্যপানের ব্যাপারে অসাবধানতা অবলম্বন করবে। শরীয়তের স্পষ্ট দলীল এবং আপনার কঠোরতার নীতি ও পদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও আপনার উম্মতের কিছু লোক অসাবধানতাবশত মদ পান করবে এবং নিজকে বাঁচানোর জন্য কৌশলের ভিত্তিতে সে মদের অন্য নাম রাখবে এবং নামের পরিবর্তনের মাধ্যমে অন্যান্যদেরকে বা নিজেকে ধোঁকা দিতে চাইবে। অথচ শুধু নাম পরিবর্তনে বাস্তবতার কোন পরিবর্তন হয়না এবং শরীয়তের হুকুমেরও পরিবর্তন হয়না। এজন্যে আল্লাহর কাছে মদ্যপানকারী দোষী সাব্যস্ত হবে এবং নাম পরিবর্তন করে ধোকাবাজী তাদের দ্বিতীয় অপরাধ হবে। হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنهُ قَالَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم يَقُوْلُ: لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

অনুবাদ: হযরত আবু মালিক আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি- তিনি ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক মদ পান করবে এবং ধোকা দেয়ার নিমিত্তে এর অন্য নাম রাখবে।

ব্যাখ্যা: ইদানিং এ খবরগুলো স্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়ে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে যে, বিভিন্ন প্রকারের মদ বিভিন্ন নাম ধারণ করে বাজারে সয়লাব হয়ে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হিফাযত করুন।

আরো একটি হাদীস সহীহ মুসলিম শরীফের রিওয়ায়েতে এসেছে। হযরত ওয়াইল ইবনে হাজর হায়রমি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত তারেক বিন সুয়াইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মদ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' কে জিজ্ঞাসা করলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মদ্যপান থেকে নিষেধ করেন। তিনি পুনরায় আরয করলেন, আমি তো একে ঔষধ হিসেবে সেবন করছি। এতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ.

অর্থাৎ- এটা তো ঔষধ নয়; বরং রোগ।

পরে তিনি ঔষধ হিসেবে সেবন করার অনুমতি দেন। এমন অসুস্থ ব্যক্তির জন্যে যার জীবনের ভয় রয়েছে। যদি অভিজ্ঞ ডাক্তার অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এর চিকিৎসায় মদ উপকারী তখন শুধু প্রয়োজন পরিমাণ ঔষধের সাথে সেবন করা যাবে।

আল্লাহ তা'আলা হারাম বস্তুতে আরোগ্য রাখেননি। অবশ্য যে হারাম খায় তার আপদমস্তক হারামের যে কোন সংমিশ্রণে অনুপ্রবেশ করে। সে সাময়িক ও অযথার্থতার ভিত্তিতে আরোগ্য হতে পারে। যেমন কোন কোন ইমাম প্রয়োজন ক্ষেত্রে মুবাহও বৈধ বলেছেন। এটা الضرورة تبيح المحظورات অর্থাৎ- 'প্রয়োজন নিষিদ্ধকেও মুবাহ করে দেয়' এর অন্তর্ভূক্ত। অন্যতায় আল্লাহ তা'আলা হারাম বস্তুতে একনিষ্ঠ মু'মিনের জন্য আরোগ্য রাখেননি। কেননা মদ এটা অকাট্য হারাম।

শিক্ষা সংস্কৃতি

ক্ষমাই হচ্ছে মহৎগুণ

মুহাম্মদ নুরুল আবছার

মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করার ফলে নিজের ইজ্জত ও মান-সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং এইরূপ লোককে আল্লাহতায়ালা ভালবাসেন। যেমন কুরআনের ভাষায় বলা হইয়াছে-

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134)

"যাহারা ধনী ও দরিদ্র উভয় অবস্থায় দান করে, নিজের রাগকে দমন করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে। আল্লাহ তাআলা দানশীল পূণ্যাত্মাগণকে ভালবাসেন। (সূরা: আল-ইমরান, আয়াত: ১৩৪) ক্ষমা করা উচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তিদের অভ্যাস। যেমন- হযরত ইমাম হোসাইন (রা:) এর একটি দাসী তরকারীর পেয়ালা অন্যমনস্কভাবে ইমামের শরীরে ফেলিয়া দেয়. দাসী তো ভয়ে কাঁপিতেছিলেন, কিন্তু রাসূলের নয়নমণি হযরত ইমাম হোসাইন (রা:) তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন।

ইমাম আবু হানিফা (রা:)কে এক ব্যক্তি একটি থাবা মারিয়াছিল, ইহাতে ইমাম সাহেব বলিলেন: "আমি ইহার জন্য তোমার নিকট হইতে কোন প্রকার প্রতিশোধ লইব না। যদি আল্লাহপাক আমাকে ক্ষমা করেন, তবে আমি তোমাকে আমার সাথে বেহেশতে লইয়া যাইব।" এইরূপ আরও অনেক ঘটনা কিতাবে উল্লেখ আছে।

ক্ষমা করা উদার, উচ্চ-সাহসী ও উচ্চ মর্যাদাশীল হওয়ার জ্বলন্ত প্রমাণ। যেমন খলিফা হারুন-অর-রশীদের এক ছেলেকে অন্য একজনের ছেলে গালি দিয়াছিল, ইহাতে খলিফার ছেলে তাঁহার দরবারে নালিশ করিলে। খলিফা সব কিছু শুনিয়া বলিলেন: "বাপু! যদি তোমার মাঝে সাহস থাকে, তবে তুমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দাও। যদি তাহা না হয়, তবে তুমি তাহাকে একটি গালির পরিবর্তে একটি গালি আর দুই-তিনটি গালির পরিবর্তে দুই-তিনটি গালি দিতে পার। সাবধান! তাহার গালির চেয়ে অধিক যেন না হয়। কারণ, এখন তুমি বাদী আর সে বিবাদী। যদি তুমি তাহাকে একটি শব্দও অধিক গালি দাও, তাহা হইলে সে বাদী আর তুমি বিবাদীতে পরিণত হইবে। ইসলাম ধর্মে প্রতিশোধের হুকুম যথার্থ সম-পরিমাণ। তাহার একবিন্দুও বেশী হইতে পারে না।"

যে ব্যক্তি নম্রতা, ভদ্রতা ও শিষ্টাচারিতা প্রদর্শন করে, আল্লাহপাক তাহাকে ইহকাল ও পরকালে উচ্চ মর্যাদা দান করিবে। নম্রতা ও শিষ্টাচারিতার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা যে মর্যাদা ও করুণা নিহত রাখিয়াছেন, সম্ভবত: তাহা অন্য কোন বস্তুর মধ্যে রাখেন নাই। কোন কবি সুন্দর বলিয়াছেন-

مٹادو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو
کہ دانہ خاک میں ملکر گلے گلزار ہوتا ہے

"তুমি যদি কিছুটা মর্যাদা পাইতে চাও, তাহা হইলে তুমি তোমার অস্তিত্বকে বিলীন করিয়া দাও, যেমন একটি বীজ তাহার অস্তিত্বকে মাটির সহিত মিশাইয়া দিয়া একটি বিরাট বাগানে রূপান্তরিত হয়।"

আত্মগৌরবের দ্বারা মানুষ বে-ইজ্জত ও লাঞ্ছিত হয়। মানব সমাজে তাহার প্রভাব কমিয়া যায়। নম্র ও শিষ্টাচার ব্যক্তি যেখানেই যাইবে, সেখানেই তাহার ইজ্জত ও স্থান মিলিয়া যায়। আত্মগৌরবকারী লোককে মানুষে হিংসা ও ঘৃণার চোখে দেখিয়া থাকে। নম্র ও শিষ্টাচার ব্যক্তির কথা প্রভাব সম্পন্ন হয়। আত্মগৌরবকারী লোকের কথার দাম কম হয় এবং লোকে তাহাদের কথাকে গ্রাহ্য করে না। নম্র, ভদ্র ও শিষ্টাচার ব্যক্তি সৃষ্টি ও স্রষ্টার অতি প্রিয় পাত্র হইয়া থাকে। বিশ্বনবী জনাবে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত:চরিত্রে নম্র, ভদ্র ও শিষ্টাচারিতাই অধিকতর পরিলক্ষিত হয়।

বিশেষ প্রবন্ধ

কেয়ামতের নিকটবর্তী যুগে সূদ ব্যাপক আকার ধারণ করিবে

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَاْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى اَحَدٌ اِلَّا اٰكِلَ الرِّبٰوا فَاِنْ لَّمْ يَاْكُلْهُ اَصَابَهٗ مِنْ بُخَارِهٖ وَيُرْوٰى مِنْ غُبَارِهٖ. (رواه ابوداؤد واحمد والنسائى وابن ماجة)

অনুবাদঃ হযরত ছাইয়্যাদুনা আবু হুরায়রা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন; মানব-জাতির নিকট এমন একটি যুগ আসিয়া পড়িবে, তখন সূদ না খাওয়া কোন লোকই থাকিবেনা। যদি সূদ না খাইয়াও থাকে, তবেও তাহার নিকট সূদের ছিটা-ফোঁটা পৌঁছিবে। (আহমদ, আবু দাউদ, নেসায়ী ও ইবনে মাজাহ্)

ব্যাখ্যাঃ কেয়ামতের নিকটবর্তী যুগে সূদের ব্যাপারটি এতই ব্যাপক আকার ধারণ করিবে এবং এতই সর্ব-সাধারণ হইয়া পড়িবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি কোন মাধ্যমে হউক বা মাধ্যম ব্যতীত হউক যেই কোন সময়ে অবশ্যই সূদ খাইয়া বসিবে, যেমন বর্তমান যুগে ইহা ঘটিতেছে।

বর্তমানে ব্যাংক ব্যবস্থা ছাড়া কোন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কোন কাজ-কর্ম চলেনা আর কোন ব্যাংক সূদ ছাড়া লেনদেন করে না। এখন ঐ সূদের টাকা দ্বারা যেই কারবার চলিবে, উহার মধ্যে অবশ্যই সূদ শামিল হইয়া পড়িবে। অধিকন্তু, কেহই সূদ গ্রহণ করিবে, কেহই সূদ প্রদান করিবে কেহই সূদের দলীল-পত্র লিখিবে, কেহই ঐ সমস্ত সূদের কারবার ওয়ালার ঘরে দাওয়াত খাইবে, কেহই ঐ সমস্ত মানুষ হইতে ধর্মীয় কাজে চাঁদা লইবে। অতঃপর এই সূদের টাকা-পয়সা যেই কোন প্রকারে প্রত্যেক জায়গায় এবং প্রত্যেক স্তরে অবশ্যই পৌঁছিয়া যাইবে।

জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, যেই ব্যক্তির উপার্জিত ধন-সম্পদ হালাল ও হারামে মিশ্রিত, তাহার সেইখানে চাকুরী করিয়া বেতন লওয়া, তাহার নিকট হইতে চাঁদা গ্রহণ করা তাহার সেইখানে দাওয়াত খাওয়া ইত্যাদি কাজ জায়েজ আছে। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ হারাম উপার্জনকারী লোকের সেইখানে না চাকুরী করা জায়েজ আছে, আর না তাহাদের সহিত কোন কাজ-কর্ম দুরস্ত আছে। তাই হাদীসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূদ ব্যাপক আকার ধারণ করিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু ঐ সমস্ত মানুষকে ফাছেক বা গুনাহ্গার বলেন নাই। নিছক সূদখোর ফাছেক বটে। কিন্তু যাহার নিকট সূদের ছিটা-ফোঁটা পৌঁছিয়াছে, তাহাকে ফাছেক বলা যাইবেনা।

আল্লাহতায়ালা হযরত মূসা (আ:)কে ফেরাউনের নিকট এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবু তালিবের নিকট লালন-পালনের জন্য রাখিয়াছিলেন, তাহাদের উভয়ের

উপার্জন হালাল ও হারামে মিশ্রিত ছিল, তাঁহাদের উপার্জন কোন একেবারে হালাল ছিলনা। যদি হালাল ও হারাম মিশ্রিত উপার্জনকারী মানুষের নিকট দাওয়াত খাওয়া এবং তাঁহাদের নিকট হইতে চাঁদা লওয়া হারাম হইত, তবে তাহাদের নিকট আল্লাহ্ পাক তাঁহার রাসূল মূসা (আ:) এবং মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লালন-পালন করাইতেন না। আর যদি হালাল-হারাম মিশ্রিত টাকা-পয়সা হইতে এই সমস্ত কাজ-কর্ম পৃথক করিয়া দেওয়া হয়, তবে বর্তমানে কোন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ-মাদ্‌রাসা, খানকাহ ইত্যাদি টিকিয়া থাকিতে পারেনা। কেননা, এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রত্যেক লোক হইতে চাঁদা লওয়া হয়। খাঁটি হালাল টাকা কিনা, উহা বিবেচনা করা হয়না, আর উহা করাও সম্ভব নহে। এই মাসয়ালাটি অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিত। উক্ত পদ্ধতিতে বর্তমান কালের ব্যাংক ইত্যাদি বিভাগের চাকুরীর অবস্থাও সকলে জানিতে পারিয়াছেন। অবশ্য এই জমানায় হালাল উপার্জন করা অসম্ভব নহে, অবশ্য মুশকিল বটে। (মিরআত ইত্যাদি)

মোট কথা এই যে, উল্লেখিত হাদীসে সূদের ব্যাপারে অতি ব্যাপক আকার ধারণ করা সম্পর্কে বর্ণনা করা হইয়াছে। উহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আশ্‌রাফ হউক বা আতরাফ হউক, সম্মানিত হউক বা অসম্মানিত হউক, যেই কোন ব্যক্তি সূদ অথবা সূদের ছিটা-ফোঁটা হইতে বাঁচিয়া থাকা বড়ই মুশকিল হইবে।

খাঁটি সূদ হইতে দূরে সরিয়া থাকাতো প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। সূদের ছিটা বা সূদ মিশ্রিত কাজকর্ম হইতে দূরে সরিয়া থাকার জন্য চেষ্টা করাও অপরিহার্য্য। যদিও ইহা হইতে দূরে সরিয়া থাকা বড় কঠিন ব্যাপার, তবুও শক্তি অনুযায়ী দূরে সরিয়া থাকার জন্য চেষ্টা করিবেন। বর্তমানে খাঁটি হালাল-রিজিক খুব কম। যদি সূদ না থাকে, তবে সেইখানে সূদের ছিটা অবশ্যই আছে। হারাম রিজিক খাইলে কুলব (অন্তঃকরণ) শক্ত হইয়া যায়। আল্লাহ্‌পাক মুসলমান সমাজকে হালাল রিজিক দান করুন এবং কুলবের কাঠিন্যতা হইতে হেফাজত করুন, আমিন।

জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, অত্যন্ত অভাবের দায়ে যদি কোন লোকের টাকার দরকার হয়, তবে সেই সময় সূদ দেওয়ার অনুমতি আছে। যেমন 'দুররে মুখ্‌তার' নামক কিতাবে আছে–

يَجُوْزُ لِلْمُحْتَاجِ الْاِسْتِقْرَاضُ بِالرِّبْحِ

অর্থ: "মুনাফা প্রদান করিয়া ঋণ ধার করা অভাবগ্রস্থ লোকের জন্য জায়েজ আছে।"

সুবহানাল্লাহ্! চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী বর্তমানে প্রকাশ পাইতেছে। আর চৌদ্দশত বৎসর পরে কি কি হইবে, উহা জনাবে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখানো এবং জানানো হইয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী এইরূপ মনে হয়, যেন তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াই বলিয়াছেন। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দৃষ্টি হইতে বিশ্বের কোন কিছু লুকায়িত ছিলনা। আল্লাহ্‌পাক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেয়ামত পর্যন্ত সবকিছুর জ্ঞান এবং প্রত্যেক যুগ-কাল ও স্থানের এলম দান করিয়াছেন।

মুনীয়াতুল মুসল্লেমীন হতে সংকলিত

মূলঃ- আল্লামা মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী (মা.জি.আ.)
অনুবাদঃ এম. এম. মহিউদ্দীন

রোযার বর্ণনা

মাছআলা: (০১)

রোজা ভঙ্গ করার বৈধ কারণ সমূহ কি? উল্লেখ থাকে যে রোজা ভঙ্গ করার জায়েজ অবস্থা সমূহ হচ্ছে অসুস্থ হওয়া কিংবা অধিক কষ্ট হওয়ার কারণে রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ ও বৈধ। যদি এই আশংকা হয় যে রোজা রাখার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ার কিংবা দ্রুত সুস্থ ও আরামবোধ না হওয়া অথবা অধিক কষ্টের কারণ হয়, তবে এক্ষেত্রে তিন ইমাম তথা ইমাম আজম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক রাহমাহুমুল্লাহ ঐক্যমত যে, রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ। তবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ:) ব্যতীত, কেননা তার মতে এমতাবস্থায় রোজা ভঙ্গ করা সুন্নাত এবং রোজা রাখা মাকরূহ। আর যদি ধ্বংস কিংবা বেশী বেশী ক্ষতি হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় ধারণা হয় তবে এক্ষেত্রে রোজা ভঙ্গ করা ওয়াজিব এবং রাখা সর্ব সম্মতক্রমে হারাম। সফরের অবস্থায় রোজা বর্জন করা মুবাহ। কমপক্ষে ৭৪/৭৫ কিলোমিটার দূরবর্তী স্থানে সফর হলে কসর ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর উক্ত সফর পদব্রজে হউক কিংবা রেলগাড়ী অথবা উড়োজাহাজ কিংবা অন্যান্য বাহনে হউক। তবে যদি সফরের মধ্যে কষ্ট অনুভব না হয় তাহলে রোজা রাখা উত্তম। আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন- وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ অর্থাৎ যদি মুসাফির অবস্থায় রোজা রাখ তা তোমাদের জন্য উত্তম হবে।

মাছআলা: (০২)

হায়েজ ও নেফাছ অবস্থায় রোজা তরক তথা বর্জন করা ওয়াজিব। রোজা রাখা হারাম। তবে যখনই পাক পবিত্র হয়ে যাবে তখনই সেই মহিলা রোজা আরম্ভ করা আবশ্যক। আর যে সমস্ত রোজা হায়েজ নেফাছ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তা রমজান শরীফের পরে পূরণ করা আবশ্যক।

মাছআলা: (০৩)

যদি কোন ব্যক্তির ক্ষুধা ও পিপাসা এত তীব্রতা ও বেশী হয় যে এই অবস্থায় রোজা রাখা সাধ্যের বাইরে হয়ে যায়, তবে এক্ষেত্রে রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ এবং ক্বাজা ওয়াজিব হবে।

বার্ধক্য কিংবা শক্তিহীনতার কারণে রোজা বর্জন করার হুকুমঃ বার্ধক্য দুর্বল ও শক্তিহীন ব্যক্তি যিনি পুরো বৎসরের কোন সময়ই রোজা রাখতে অক্ষম তার ক্ষেত্রে রোজা তরক (বর্জন) করা জায়েজ। তবে তার উপর ওয়াজিব যে প্রতিদিনের রোজার পরিবর্তে একজন অভাবীকে খানা খাওয়ানো। এই হুকুম সেই অসুস্থ ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য। যার শারীরিক সুস্থতার কোন প্রকার আশা করা যায় না। তাদের বেলায় ফিদিয়া দেওয়ার পর রোজা ক্বাজা করা ওয়াজিব নয়।

মাছআলা: (০৪)

যদি কোন ব্যক্তি পবিত্র রমজান মাসে রোজা রাখতে অক্ষম। কিন্তু রমজানের পর অন্য সময়ে রোজা ক্বাজা করার শক্তি রাখে তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে সে সময় রোজা ক্বাজা করা। এর জন্য ফিদিয়া নাই।

মাছআলা: (০৫)

মৃত ব্যক্তির ক্বাজা হওয়া রোজার হুকুম কি? প্রকাশ থাকে যে, যদি মৃত ব্যক্তি ফিদিয়া আদায় করার জন্য অসিয়ত করে থাকে তবে তার ওয়ারিশদের উচিত যে মৃতের সম্পদের এক তৃতীয়াংশ হতে ফিদিয়া আদায় করা যদি অসিয়ত না করে থাকে এবং ওয়ারিশ বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক হয় তবে তাদের পক্ষ হতে ফিদিয়া আদায় করতে হবে। এর

দ্বারা মৃতের পরকালে ফায়েদা হবে এবং ওয়ারিশদের ও দাওয়াব অর্জিত হবে। তবে না বালেগ তথা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ওয়ারিশদের সম্পদের অংশ হতে ফিদিয়া আদায় যেন না হয়।

মাছআলা: (০৬)

নফল রোজা রাখার পর ভঙ্গ করার হুকুম কি? এর উত্তরে বলা যায় যে নফল রোজা রাখার পর যদি ভঙ্গ করা হয়। সেক্ষেত্রে এর ক্বাজা করা ওয়াজিব। হানাফী ওলামাগণ নফল রোজা ভঙ্গ করা মাকরূহে তাহরীমি এবং এর ক্বাজা করাও মাকরূহে তাহরীমি বলেছেন। মালেকী মাজহাবের ফকীহবিদগণের মতে যে রোজা কোন ব্যক্তি নফল হিসাবে রেখেছে এবং তার মা বাবার মধ্য হতে কোন একজন কিংবা শাইখ মেহেরবানী ও স্নেহ পরবশ হয়ে রোজা ইফতার করার হুকুম দিলে সেক্ষেত্রে ভঙ্গ করা জায়েজ আছে এবং এর ক্বাজা দিতে হবে না।

মাছআলা: (০৭)

হামেলা অর্থাৎ গর্ভবতী মহিলা কিংবা দুগ্ধ পোষা মহিলার (যে মহিলা শিশুদের দুধ প্রদান করে) যদি এই আশঙ্কা হয় যে রোজা রাখতে গিয়ে তার জান কিংবা বাচ্চা অথবা উভয়ের ক্ষতির আশঙ্কা হয় এ ক্ষেত্রে সেই মহিলা রোজা না রাখা জায়েজ আছে। তবে এ সমস্ত মহিলার উপর পরবর্তীতে রোজা ক্বাজা করা ওয়াজিব। ফিদিয়া ওয়াজিব নয়। আর ক্বাজা রোজা ধারাবাহিকভাবে প্রতিদিন রাখা ওয়াজিব নয়। নিজ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দুধ পানকারী মা কিংবা বেতনধারীনী দুধ পানকারী মহিলা উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যদি মা হয় তবে তার উপর শরীয়তের দৃষ্টিতে দুধ পান করানো ওয়াজিব। দুধ পান করানো যদি বদলা তথা বেতন নির্ধারণের ভিত্তিতে হয় তবে দুগ্ধপোষ্য শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা করা ওয়াজিব।

কতক রোজা যা মাকরূহে তানজীহি এর বর্ণনাঃ

يوم عاشورا তথা মহররমের ১০ তারিখের রোজা যার সাথে সাথে ৯ তারিখ কিংবা ১১ তারিখের রোজা মিলানো না হবে, তবে তা মাকরূহে তানজীহি। অর্থাৎ শুধুমাত্র ১০ই মুহররম দিবসে একটি রোজা রাখা।

অনুরূপ নববর্ষের রোজা এবং উৎসব মুখর দিবসের রোজা রাখা, তবে শর্ত হচ্ছে এটি সেদিন না হয় যেই দিন সে ব্যক্তি আগে থেকেই রোজা রেখে আসতেছে। দায়েমী রোজা তথা সর্বদা রোজা রাখা যার দরুন শরীরে দুর্বলতা লাহিক তথা অনুভব হয়।

صوم وصال তথা সর্বদা রাত দিন খানা-পিনা ইত্যাদি হতে নিজেকে বিরত রাখাও মাকরূহ। মুসাফির অবস্থায় রোজা রাখা, যখন রোজা রাখা তার কষ্ট ও কঠিন হবে, সেক্ষেত্রে ও রোজা রাখা মাকরূহ।

হুজুর সৈয়াদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বেলাদত দিবসের রোজা, কেননা এটি ঈদের সদৃশ্য এ জন্য উক্ত দিবসে রোজা রাখাও মাকরূহ।

অসুস্থ ও মুসাফিরের ন্যায় যদি গর্ভবতী মহিলা দুধ পানকারী মহিলা এবং বার্ধক্য জনিত পুরুষ মহিলা যারা রোজা রাখা কষ্টকর হবে কিংবা মারাত্মকভাবে শারীরিক দুর্বলতার আশঙ্কা তারাও রোজা রাখা মাকরূহ। অনুরূপ কোন ফরজ রোজার ক্বাজা ওয়াজিব হওয়া অবস্থায় তা আদায় না করে নফল রোজা রাখা মাকরূহ। কেননা ফরজ রোজা আদায় করা নফলের চেয়ে আবশ্যকতা বেশী।

মাছআলা: (০৮)

নফল রোযা রেখে ভেঙ্গে দেওয়ার বিধান: নফল রোযা রাখার পর যদি ভেঙ্গে দেয় তখন তার কাযা রাখা ওয়াজিব। ওলামায়ে আহনাফ নফল রোযা ভেঙ্গে দেওয়াকে মাকরূহে তাহরীমি বলেন। তার কাযা রাখাও মাকরূহে তাহরিমী।

ফুকাহায়ে মালেকীদের নিকট ঐ নফল রোযা যা নফল হিসাবে রেখেছে তার মাতাপিতা বা শায়খ রোযা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করল তখন ভেঙ্গে দেওয়া বৈধ। তার কাযা নেই।

মাছআলা: (০৯)

গর্ভবতী বা দুধপানকারিণী মহিলার যদি আশঙ্কা হয় রোযা রাখলে নিজের জানের বা বাচ্চার বা উভয়ের ক্ষতির আশংখা রয়েছে তখন তার জন্য রোযা ছেড়ে দেওয়া বৈধ এরকম মহিলাদের উপর সামর্থ হলে কাযা ওয়াজিব ফিদিয়া দিলে হবে না এবং কাযা লাগাতারও রাখতে হবে না।

দুধপানকারিণী মহিলা বা মজুরী নিয়ে দুধপানকারিণী মহিলা উভয়ের একই হুকুম। যদি মা হয় তখন তার উপর শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব আর যদি মজুরী নিয়ে দুধ পান করানো হয় তখন মুসাহেরার দিক দিয়ে দুধ পান করানো ওয়াজিব হয়ে পড়ে।

কিছু রোযা রাখা মাকরূহে তানযিহী:

১. আশুরার রোযা একা রাখা, নয় বা এগার তারিখ ব্যতীত।
২. নববর্ষ ও মেহেরজান তথা উৎসবমূখর রোযা রাখা যদি তা তার অভ্যাসের তারিখে না পড়ে।
৩. অনবরত রোযা রাখা। যার কারণে দূর্বলতা এসে যায়।
৪. সওমে বেছাল তথা রাত-দিন ইফতার না করে রোযা রাখা।
৫. মুসাফির রোযা রাখা যদি রোযা তার উপর কঠিন ও কষ্টদায়ক হয়।
৬. রাসূলের জন্মের দিন ঈদের সাদৃশ্য তাই সেদিন রোযা রাখা মাকরূহ।
৭. রোগী ও মুসাফিরের মত যদি গর্ভবতী মহিলা ও দুধপানকারিণী মহিলা ও বয়স্ক পুরুষ-মহিলা যাদের রোযা রাখা কষ্ট বা ক্ষতির আশংখা রয়েছে তাদেরও রোযা রাখা মাকরূহ।
৮. কোন ফরয রোযার কাযা থাকা সত্ত্বেও নফল রোযা রাখা মাকরূহ কেননা নফলের চেয়ে ফরযের কাযা করা উত্তম।

মাছআলা: (১০)

রোযা ছেড়ে দেওয়ার বৈধ পদ্ধতি: ১. রোগ ২. অধিক কষ্টের কারণে রোযা ভেঙ্গে দেওয়া বৈধ। যদি কেউ আশংখা করে যে, রোযা রাখলে রোগ বেড়ে যাবে বা দেরিতে রোগ নিরাময় হবে বা কঠিন কষ্ট ভোগ করবে তখন এসকল পদ্ধতিতে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক (রহ:) একমত যে, তাদের জন্য না রাখা বৈধ। ইমাম আহমদের নিকট রোযা না রাখা মুস্তাহাব, রাখা মাকরূহ। আর যদি রোগ বাড়ার ও কষ্ট দীর্ঘায়িত হয় তখন রোযা না রাখা ওয়াজিব। রাখা হারাম। মাঝারের অবস্থায় রোযা ছেড়ে দেওয়া মুবাহ। যদি সফর এত বেশী দূরে হয় যেখানে কসর ওয়াজিব হয় ৭৪/৭৫ কিলোমিটার সফর হয় তা হেঁটে হোক বা গাড়িতে হোক তখনও রোযা ছেড়ে দেওয়া বৈধ। তবে যদি সফরে কোন কষ্ট না হয় তখন রোযা রাখা উত্তম। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ

অর্থ: যদি তোমরা সফরে রোযা রাখ তা উত্তম।

মাছআলা: (১১)

যে মুসাফির রাত থেকে রোযার নিয়ত করেছে সে ফজর উদয় হওয়ার পর সফর শুরু করেছে তখন তার জন্য রোযা ভেঙ্গে দেওয়া বৈধ। যদি ভেঙ্গে দেয় তখন কাযা ওয়াযিব আহনাফের মতে কাফ্ফারা দিতে হবে না।

মাছআলা: (১২)

হায়েয ও নেফাসের সময় রোযা ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব। রোযা রাখা হারাম। কিন্তু সে যখন পবিত্র হয়ে যাবে তখন রোযা রাখা শুরু করে দিতে হবে এবং যে সকল রোযা বাদ গেল তা রমযানের পরে কাযা করে দেবে।

মাছআলা: (১৩)

যদি কারো অধিক পিপাসা বা ক্ষুধা লেগেছে তখন রোযা বরদাশত করা কঠিন হয়ে গেল তখন রোযা ভেঙ্গে দেওয়া বৈধ এবং তার কাযা করা ওয়াজিব। বয়স বেশী হওয়ার কারণে রোযা ছেড়ে দেওয়ার বিধান। যে ব্যক্তি বয়সের কারণে রোযা রাখতে অক্ষম তখন তার জন্য রোযা ছেড়ে দেওয়া বৈধ। কিন্তু তার উপর প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন গরীবকে দু'বেলা খাবার দিতে হবে। একই হুকুম ঐ রোগীর যে সুস্থ হওয়ার আশা রাখে না ফিদিয়া দেওয়ার পরে তাকে আর কাযা করতে হবে না।

মাছআলা: (১৪)

যদি কোন ব্যক্তি রমযান মাসে রোযা রাখার সামর্থ না রাখে তবে সে অন্য সময়ে কাযা করতে পারবে তখন তার উপর কাযা করা ওয়াযিব ফিদিয়া দেওয়া বৈধ হবে না।

মাছআলা: (১৫)

মৃতের কাযা রোযার কি হুকুম?

যদি মৃত ফিদিয়া দেওয়ার অসীয়ত করে তখন তার উত্তরাধিকারের উচিত তার রেখে যাওয়া সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে ফিদিয়া আদায় করবে যদি সে অসীয়ত না করে এবং উত্তরাধিকার বালেগ থাকে তখন তারা ফিদিয়া আদায় করতে পারবে। তা দ্বারা তার পরকালে ফায়দা হবে তবে নাবালেগ উত্তরাধিকারের অংশ থেকে ফিদিয়া আদায় সহীহ হবে না। (ইসলামী ফিকাহ)

শায়খে ত্বরীক্বত আল্লামা **মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী** (মা.জি.আ.)'র রচিত ও

গ্রন্থাবলীর নাম

- ❑ তাফসীর-ই ফউযুল আজিজ
- ❑ ফরমানে মোস্তফা (দ.)
- ❑ ইরশাদে মোস্তফা (দ.)
- ❑ ফাযায়েলে দরূদ শরীফ
- ❑ আত্ তোহফাতুল মাতলুবা
- ❑ মিলাদে মোস্তফা (দ.)
- ❑ আল্-বায়ানুল মোছাফ্ফা কী মাসয়ালাতে আবদিল মোস্তফা (দ.)
- ❑ আযানের আগে দরুদ পড়া জায়েয
- ❑ আস্ সায়েক্বাহ
- ❑ আল-কাওলুল হক
- ❑ আল বোরহান
- ❑ আত্-তোহফাতুল গাউছিয়া
- ❑ আল্-বায়ানুন্-নাজীহ ফী নেজাতে আম্মিন্ নবী (দ.)
- ❑ কেফায়াতুল মোবতাদী ফী মোস্তালেহাতে হাদিসিন্ নববী (দ.)
- ❑ আত্-তাওজীহুল জামিল বে-শরহে হাদিসে জিবরীল
- ❑ আত্-তাহকীকুল আ'জীব আ'লা ছালাতিন নাবীয়িল হাবীব (দ.)
- ❑ আদ্-দালায়েলুল ওয়াজেহাত ফী হুরমতে ছুজুদিত্ তাহিয়াহ
- ❑ তানজীহুল জালীল আনিশ্ শিব্হে ওয়াল মাছিল
- ❑ তাজকেরাতুল মাক্বামাতির রাফীয়াহ লিল-ইমাম আবি হানিফাহ ফীল আহাদিছিন নববীয়াহ
- ❑ আচ্ছালাতুত্ তা-তাউওয়ায়ু বে-ইক্বতেদায়ীল মুতাউয়ে
- ❑ রাফিকুল মোসাফেরিন ফী মাসায়েলিল হজ্বে ওয়া জিয়ারতে সৈয়্যদিল মুরসালীন (দ.)
- ❑ আত্-তাবছীর ফী মাসয়ালাতিত্ তাকফীর
- ❑ কালামুন আউলিয়া ফী শানে ইমামিল আউলিয়া
- ❑ হাকীকতে ইসলাম
- ❑ মুনীয়াতুল মুছল্লেমীন
- ❑ শাজরা শরীফ (তরিকায়ে কাদেরীয়া চিশতীয়া)
- ❑ আল্-ফাউযুল মুবীন (সূরা-ইয়াসিন শরীফের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ)
- ❑ তাকবীলুল ইবহেমাইন ইনদা ছেমায়ে বে ইছমে সৈয়্যদিল কাওনাইন
- ❑ শানে গাউছুল আজম
- ❑ আল-মোকাদ্দমা
- ❑ আল-মারজান মিন মোখতারুচ্চহীহাইন (১ম খন্ড -উর্দু ও বাংলা)
- ❑ আল-মারজান মিন মোখতারুচ্চহীহাইন (২য় খন্ড -উর্দু ও বাংলা)
- ❑ আল-মারজান মিন মোখতারুচ্চহীহাইন (৩য় খন্ড -উর্দু ও বাংলা)
- ❑ আক্বায়েদুল ইসলাম (আরবী, আরবী-বাংলা)
- ❑ কুর্রাতুল উয়ুন (আরবী-বাংলা)
- ❑ তরিকুচ্ছালাত আ'লা ছাবিলিল ইজাজ (আরবী, আরবী-বাংলা)
- ❑ আল্-ফাওয়ায়েদুল 'উযমা
- ❑ শানে মোস্তফা (দ.)
- ❑ ফতাওয়া আল্-আযীযী মিন ফয়ুজিল কাজেমী
- ❑ তানবীহুল মো'মেনীন বা শিয়া মায্হাব হতে হুশিয়ার
- ❑ আন্ নুফুছুল কুদ্ছিয়া ফি ছালাছিলে আউলিয়া ইল্লাহ
- ❑ আল্লাহ মিথ্যা বলার ক্ষমতা রাখেন কিন্তু বলেন না, এধরনের ধারণা পোষণ করা কুফুরী
- ❑ দরুদে কিব্রিতে আহমর শরীফ
- ❑ আওদ্বাহুল বয়ান মিন আয়াতিল ফুরকান-১ম খন্ড
- ❑ আওদ্বাহুল বয়ান মিন আয়াতিল ফুরকান-২য় খন্ড
- ❑ ওহাবী-খারেজী ও মওদূদী- জামায়াতের কোরআন হাদীস তথা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক আক্বীদাসমূহ
- ❑ কছিদায়ে বোরদা শরীফ পাঠের তারতীব
- ❑ তারীখী নজদী ইত্যাদি।

প্রাপ্তিস্থান

◆ *ছিপাতলী জামেয়া গাউছিয়া মুঈনীয়া কামিল মাদ্রাসা*
◆ *হাটহাজারী আনোয়ারুল উলুম নোমানীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা*
◆ *বেতবুনিয়া মুঈনুল উলুম রেজভীয়া সাঈদীয়া দাখিল মাদ্রাসা*
◆ *মোহাম্মদী কুতুবখানা* ◆ *রেজভী কুতুব খানা*

শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

আন্জুমানে কাদেরীয়া ভবন, *১৬/২ পুরাতন টি এন্ড টি রোড, কোতায়ালী, চট্টগ্রাম।*